ঝাঁসীর রাণী
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মূল্য দেড় টাকা

কেন বড় হইল তাহা সুধীবর্গই বিচার করিবেন। গ্রন্থমধ্যে যে-কয়খানি চিত্র সংযোজিত হইল, তাহা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পরম প্রীতি-ভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অঙ্কিত। সেজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আজ এই পুণ্য স্বাধীনতা দিবসের শুভ স্মরণীয় আনন্দ উৎসবের দিনে ঝাঁসীর রাণীর অনবদ্য বীরত্ব-কাহিনী দেশবাসীর করকমলে উপহার দিয়া ধন্য হইলাম।

কলিকাতা,
৩৭এ, মহানির্ব্বাণ রোড,
১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁসীর রাণী বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হওয়ায় বুঝিয়াছি যে, পাঠকসমাজে এ বইখানির আদর হইয়াছে।

এসংস্করণে অনেক নূতন তথ্য সযত্নে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস প্রণীত "ঝাঁসী সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র' নামক বইখানিতে প্রখ্যাত বীরাঙ্গনা মহারাণী লক্ষ্মী-বাইএর একটি প্রামাণিক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের একটি জাতীয় অভাব মোচন হইয়াছিল। গ্রন্থটি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার মহারাণীর জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে, ইংরাজী গ্রন্থ, দেশীয় গ্রন্থ, সরকারি কাগজপত্রাদি যেখানে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বার্ত্তা পাইয়াছেন, তৎসমুদয় তন্ন তন্নরূপে বিচার করিয়া গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

পারসনীস প্রণীত ঝাঁসীর রাণীর জীবনচরিতের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অনুবাদের প্রকাশ কাল—১৩১০ সাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐ বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া রাণীর জীবনের মূল ঘটনাগুলি প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে আমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গানুবাদ দেখিবার সুযোগ হয় নাই, এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার হইতে সে বইখানি সংগ্রহ করিয়া দেখিবার সুযোগ হওয়ায় বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা হইতে কিছু কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। সেজন্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ
স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬ লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ : ২রা এপ্রিল, ১৯৪৯

মুদ্রাকর
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দি নিউ বেঙ্গল প্রেস
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ গৌতম গুপ্ত

দাদুভাই করকমলেষু

শতবর্ষ আগে,
বিদ্রোহের অগ্নিশিখা দিকে দিকে জাগে।
হাহাকার, নির্য্যাতন, কামান গর্জ্জন,
"দিল্লী চলো" !—বিদ্রোহীর বাণী সে ভীষণ
ঝাঁসীর প্রশান্ত বুকে আগুন জ্বালিয়া,
বিদ্রোহ-অনল মাঝে আনিল ডাকিয়া—
সুষুপ্ত শান্তির রাজ্যে ; ক্রুদ্ধ দর্পে শুনি
গরজে ঝাঁসীর রাণী দলিতা ফণিনী—
'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি !' আজো শোনা যায়,
সে বাণী ধ্বনিয়া উঠে—নিখিলের গায়।

সেই পুণ্য অবদান,
তোমারে করিনু দান।

স্বাধীনতা-সূর্য্য দীপ্ত ভারত-গগনে,
জাগো ভাই বীর দর্পে প্রফুল্ল বদনে।
জীবনের শেষ প্রান্তে—অই যায় দেখা,
আবার সে রক্ত-দীপ্ত সন্ধ্যারুণ লেখা।
তারি মাঝে দিনু আজ, তোর হাতে তুলি,
আমার স্নেহের অর্ঘ্য দীপ্ত পুষ্পাঞ্জলি !

কলিকাতা
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৪

তোমার
দাদুভাই
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'কাণপুরের যুদ্ধে জয়' নামক দীর্ঘ কবিতায় ঝাঁসীর রাণীর সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় কবির যোগ্য হয় নাই।

ঝাঁসীর রাণীর দেশের স্বাধীনতার জন্য অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী কবি উপহাসের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

সমসাময়িক অনেক বাঙ্গালী কবি ঝাঁসীর রাণীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের উল্লেখ করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঝাঁসী অঞ্চলে রাণীর সম্বন্ধে একটি গাঁথাও প্রচলিত আছে। ভবিষ্যত সংস্করণে তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আশা করি পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণের বইখানিও সকলে প্রীতির চক্ষে দেখিবেন।

কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৫৬ সাল
ইংরাজী ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৯

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভূমিকা

শুভ স্বাধীনতা দিবসে 'ঝাঁসীর রাণী' প্রকাশিত হইল। যে বীরাঙ্গনা শতবর্ষ পূর্ব্বে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভীষণ সমরানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এ তাঁহারই পুণ্য অবদান কাহিনী।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার জন্য একটা আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার পরিণাম যে শুভ হয় নাই, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সে-সময়ে বিদ্রোহী হিন্দু, মুসলমান, মারাঠা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীরা পরস্পরে মিলিতভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগ্য নেতা ও সৈন্যাধ্যক্ষের সুনিপুণ পরিচালনার অভাবে তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। তাহার অন্য একটি প্রধান কারণও এই ছিল যে, সৈন্যদল নানা বিভিন্ন স্থান হইতে আসার ফলে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের অভাব ছিল এবং অনেকেরই চিত্তের দৃঢ়তা এবং সাহস ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হয়ত সৈন্যদল কোথাও ছাউনি করিয়াছে, বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময়ে দূর হইতে সহসা একটা হল্লা শোনা গেল—'গোরা আয়ে! গোরা আয়ে!' অমনি সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—'ক্যায়া হুয়া ভ্যাইয়া—ক্যায়া হুয়া ভ্যাইয়া', অপর দল উত্তর দিল—'ভাই খবরদার, গোরে আয়ে! গোরে আয়ে!' সে সময়ে বিদ্রোহী-সেনারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান এবং অপেক্ষা না করিয়াই সে স্থান ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানের দিকে ধাওয়া করিল!

উপযুক্ত নেতার অধীনে সাহস ও সংযমের সঙ্গে যদি বিদ্রোহ পরিচালিত হইত—তাহা হইলে হয়ত ১৮৫৭-১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই ভারতে স্বাধীনতার সৌভাগ্যরবি নবভাবে প্রকাশ পাইতেন।

অপর দিকে ব্রিটিশরাজ বিপন্ন ও মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও সাহস, সংযম, শৃঙ্খলা ও ঐক্য হারান নাই, কিংবা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহাদের মনের বল, দৃঢ়তা, সাহস ও বীরত্বের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার ফলেই অবশেষে ইংরাজ বিজয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। ইংরাজের ন্যায় এ সমুদয় গুণের অধিকারিণী ছিলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই। বিদেশী শত্রুপক্ষীয় ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও কেহ কেহ একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। স্বয়ং স্যার-হিউ-রোজ তাঁহার লিখিত বিবরণীতে লিখিয়াছেন:

"The best man upon the side of the enemy was the woman found dead, the Rani of Jhansi."

তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নামে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সে সব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা আমরা এ গ্রন্থমধ্যে বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আর্থার ডি. ইনেস্ (Arthur D. Innes) বলেন: "Jhansi inspired by her ex-rani (-- who has been called the Indian Joan of Arc) was the one principality, if it could still be entitled which bade open defence to the British."—অর্থাৎ ঝাঁসীর রাণীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ব্রিটিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঝাঁসীর সৈন্যদল অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল—রাণী লক্ষ্মীবাইকে ভারতের

'জোয়ান্ অব আর্ক' বলা হইয়া থাকে। কোন কোন ইংরাজ লেখক তাঁহাকে "The Swarthy Boadicea" এবং "The Jezebel of Jhansi" নামে অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গিনী বোয়েডিসিয়া এবং ঝাঁসীর জিজেবেল নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ঝাঁসীর রাণীর সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক মেলিসন (Colonel Malleson) লিখিত "Indian Mutiny," Kaye's Sepoy War, Sir Hugh Rose's Despatch, April 30th, 1858, Martin's "Indian Empire", Justin Mac Carthy লিখিত "A History of our times", Captain Pinknayর লিখিত সিপাহী-বিদ্রোহের Report বা বিবরণী-সমূহে রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে আরও অনেক পুঁথিপত্র ও রিপোর্ট ইত্যাদি আছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত রাও বাহাদুর ডি, পি, পারস্নীস্ (Rao Bahadur D. P. Parsnis) প্রণীত 'মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেবাকা জীবন-চরিত' নামক বইখানা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাইয়ের পোষ্যপুত্র দামোদর-রাও গঙ্গাধর-রাও তৎকালে জীবিত ছিলেন। সুপণ্ডিত পারসনীস প্রণীত 'ঝাঁসীর রাণী' গ্রন্থখানি অবলম্বনে ১৩১০ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঝাঁসীর রাণী' নামে একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন, এ বইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন, পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রভৃতিও ঝাঁসীর রাণী সম্পর্কে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার পারসনীস লিখিত বইখানি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে।

আমরা ঝাঁসীর রাণীর সম্পর্কে যাহা কিছু তথ্য সম্ভবপর তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। ছোট বইয়ের ভূমিকা বড় হইল।

গোয়ালিয়র তুর্গ

—এক—

“মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি”
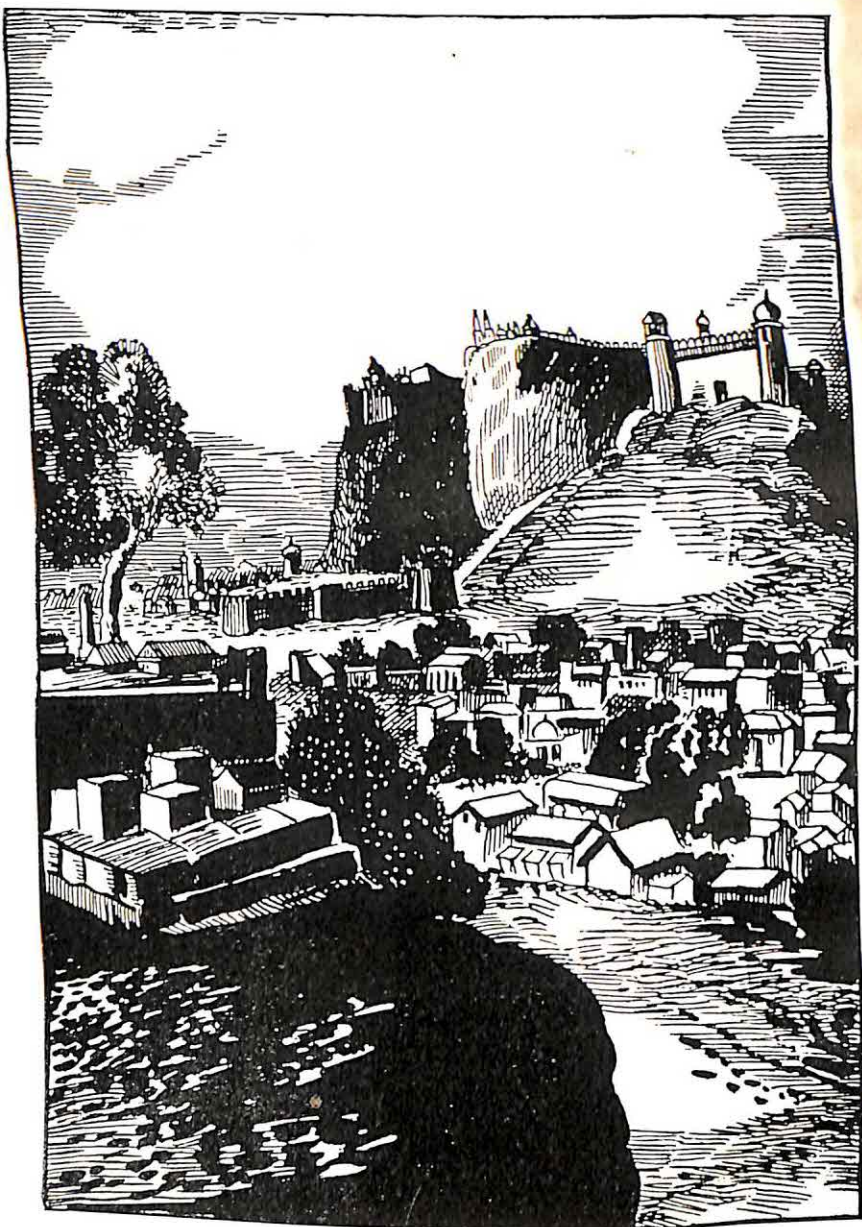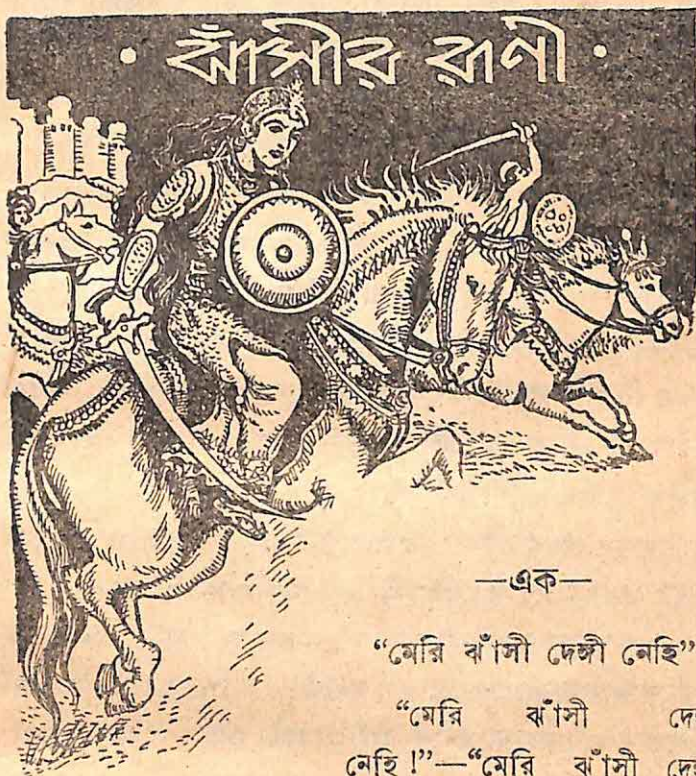
“মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!”—“মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!” সেদিন গভীর নিশীথে রাজপ্রাসাদের দরবার-কক্ষে সুন্দরী তরুণী রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কণ্ঠে এই বাণী বার বার উচ্চারিত হইতে শুনিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী লক্ষ্মণ-রাও বলিলেন: বিরোধ কি ভাল, মহারাণি! শক্তিশালী ইংরাজের বিরুদ্ধে, কোম্পানীর তোপের

মুখে কি আমাদের দাঁড়ানো সম্ভব হবে? তার চেয়ে কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি করাই কি ভাল নয়?

ভীষণ অবস্থা! ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁসী নগরী আক্রমণ করিয়াছে। গোলাগুলির গর্জ্জনে নগর-প্রাচীর কাঁপিতেছে, ধ্বসিয়া পড়িতেছে—দলে দলে নরনারী শিশু-বালক-যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য ছুটিতেছে,—চারিদিকে হাহাকার —আর্ত্তনাদ! বিলাপের করুণ রাগিণী তোপের ভীমভৈরব-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যাইতেছে। মৃত্যুদূত রাজ্যের সর্ব্বত্র বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। এহেন দুর্দ্দিনে কেমন করিয়া ঝাঁসী-রাজ্য রক্ষা পায়, কেমন করিয়া ইংরাজের আক্রমণ হইতে ঝাঁসী দুর্গ, ঝাঁসী নগর রক্ষা পাইতে পারে—সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য রাণী গভীর নিশীথকালে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার, অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদের লইয়া এক দরবারের আহ্বান করিয়াছিলেন। যুদ্ধের হানাহানি চলিতেছে —বিপক্ষের কামানের সঙ্গে দুর্গ হইতেও তোপের গর্জ্জন সমভাবে চলিতেছে। সমান ভাবে দুর্গ-প্রাকার হইতে গোলন্দাজেরা তোপ হানিতেছে।

মন্ত্রী লক্ষ্মণ-রাওয়ের কথায় দৃঢ়কণ্ঠে রাণী বলিলেনঃ বেইমান ইংরাজের জন্য আমি প্রাণপণ করে রাজ্য রক্ষা করেছিলাম, বিদ্রোহীদের আক্রমণ হ'তে রাজ্য ও রাজধানী রক্ষা করেছিলাম, তবু তারা আমায় বিশ্বাস করেনি, সে অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেব! আমি ইংরাজের সঙ্গে কলহ করতে চাইনি,

তারাই আমাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। যুদ্ধ আমি করবোই—মৃত্যুবরণ আমার পণ! শুনুন সর্দ্দারগণ, শুনুন মন্ত্রীসাহেব! জীবন থাকতে—একবিন্দু রক্ত এ দেহে থাকতে 'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!' আমার ঝাঁসী দেব না—কিছুতেই না।

একজন সর্দ্দার বলিলেনঃ রাণীসাহেবা! সুশিক্ষিত ইংরাজ-সেনার বিরুদ্ধে কৌশলী ইংরাজের তোপের মুখে ঝাঁসীর এগারো হাজার সৈন্য কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে? মৃত্যু স্থির জেনে, পরাজয় নিশ্চিত জেনে, কে কবে মৃত্যুকে বরণ করে, কে চায় রাজ্যহানি? সন্ধিই কি ভাল নয়? ইংরাজের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সকলের প্রাণরক্ষা করুন। এমন সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সর্ব্বনাশ করবেন না, এ আমার একান্ত মিনতি রাণীসাহেবা!

তেজস্বিনী, মনস্বিনী রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল দীপক রাগ; তিনি বলিলেনঃ আপনারা কি চান—ইংরাজের এ হীন প্রস্তাব আমি মেনে নিই? আমি যাব ভিখারিণীর মত আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে, গর্ব্বিত মারাঠাজাতির গৌরব-হানি করে—রাজ্যের মান ও মর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করতে? আমি একদিন নয়—দু'দিন নয়—দশ মাস ধরে প্রাণপণে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলেছি, এই কি তার পরিণাম? এই কি বিশ্বস্ততার পুরস্কার? আপনারাই বলুন, সর্দ্দারগণ বলুন, মন্ত্রীসাহেব, আমার অভিযোগ কি অসত্য?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া রাণী কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিলেন এবং বজ্রগর্জ্জনকেও হার মানাইয়া আবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন : এই কৃপাণ আমাকে রক্ষা করবে বিপদের হাত থেকে। মাথা নীচু করে অপমানের বোঝা শির পেতে নিয়ে শান্তিভিক্ষা আমি করবো না। এ আমার দৃঢ় পণ! যদি আপনারা সকলে আমাকে ত্যাগ করেন—বিদ্রোহী হন, বিপ্লবের সৃষ্টি করেন, তবু আমি ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করবো—আমি আবার বলি শুনুন আপনারা—'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!'

কি ছিল রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কণ্ঠস্বরে, কি ছিল তাঁর লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার ভিতর, কি ছিল তাঁর অনুপম তনু-ভঙ্গিমায়, কি ছিল তাঁর তেজে ও বীর্য্যে, সেই ভারত-বীরাঙ্গনার অনবদ্য মূর্ত্তিতে—কে জানে?

রাণীর এই তেজঃপূর্ণ বাণীতে সকলে এককণ্ঠে বলিয়া উঠিল রাণীর সুরে সুর মিলাইয়া : না না, সে হ'তে পারে না। মা, আমরা প্রাণ থাকতে ঝাঁসী কখনও তুলে দেব না ইংরাজের হাতে, আমরা লড়াই করে প্রাণ দেবো। জয় মহারাণী লক্ষ্মীবাইকি জয়!

সেদিন সেই পরামর্শসভায় স্থির হইল—নানাসাহেব ও অন্যান্য বীরগণকে জানাইয়া দিতে হইবে রাণীর এই দৃঢ় পণের কথা!
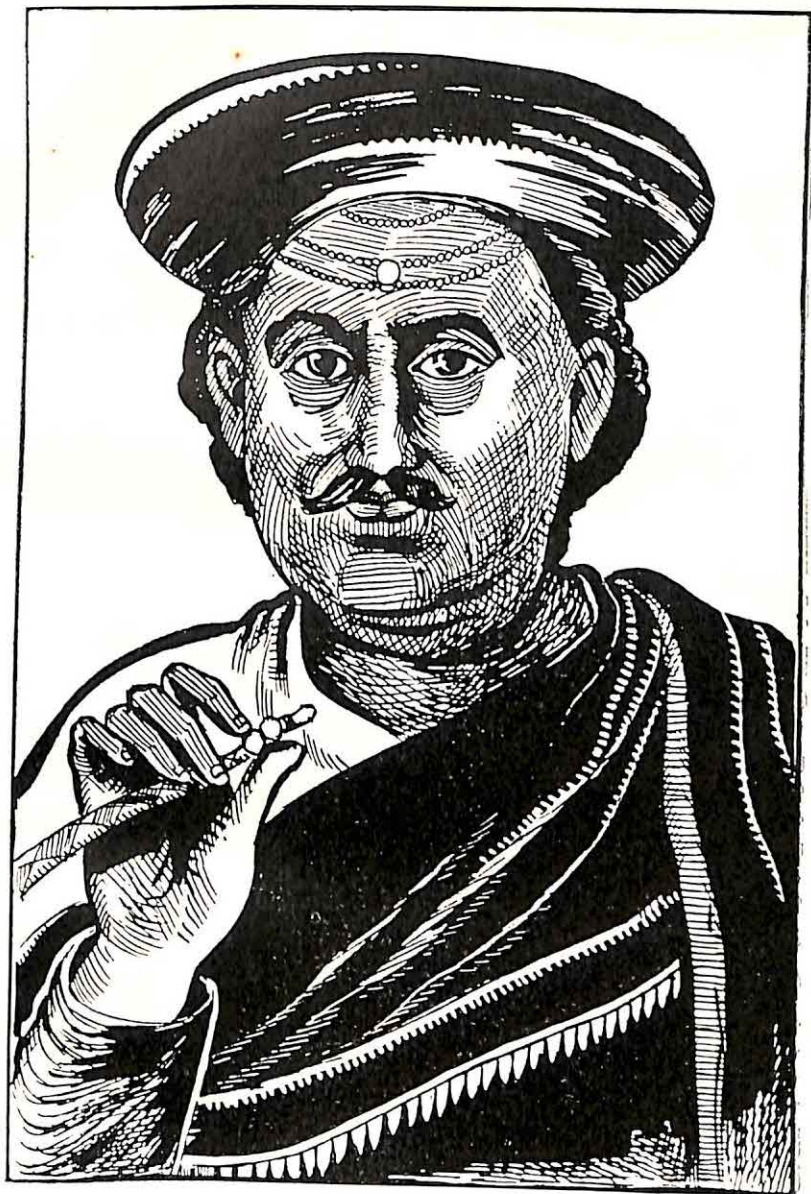
নানাসাহেব
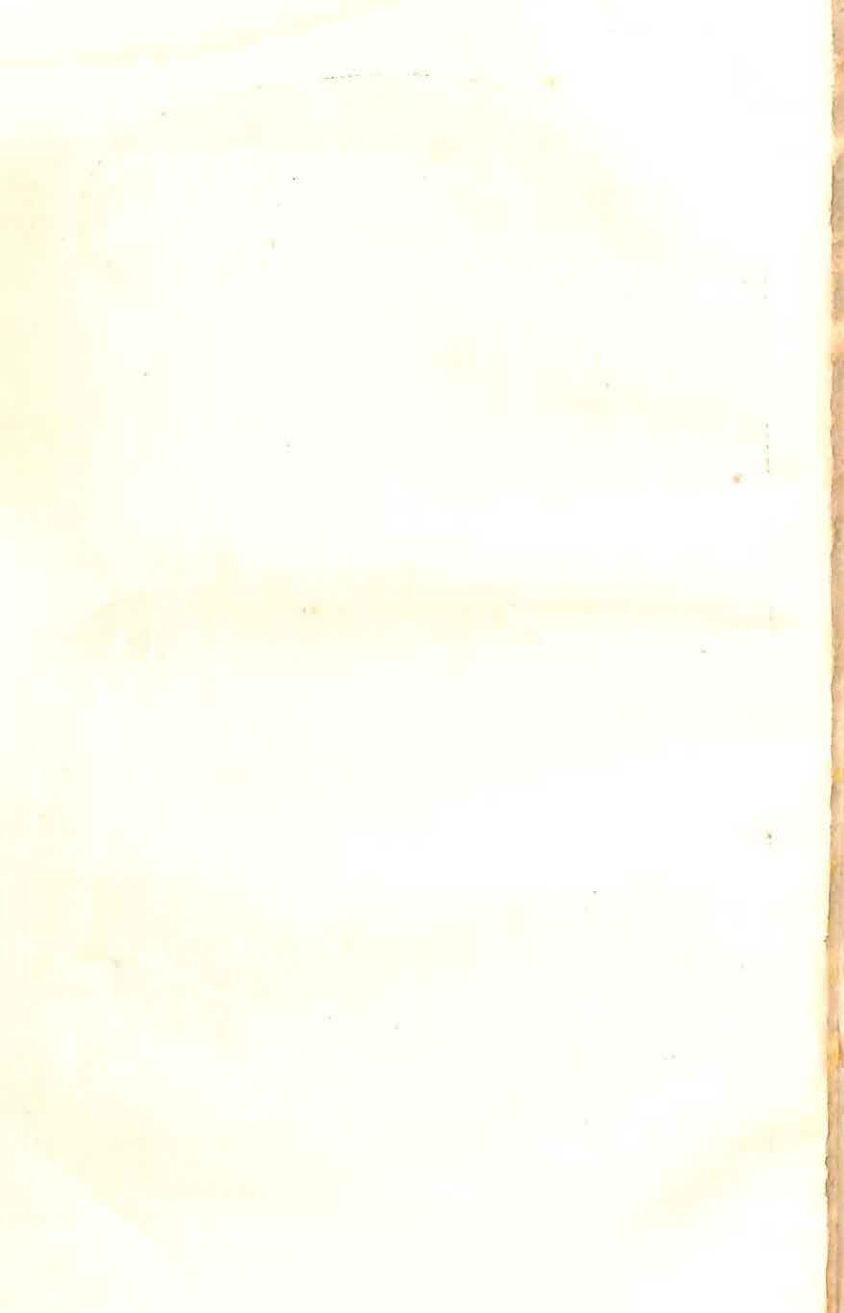
রাণী নিজে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ঝাঁসী রক্ষা করিতে প্রাণ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।

কে ছিলেন এই তেজস্বিনী নারী? কে ছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাই? ঝাঁসী রাজ্যই বা কোথায় ছিল—সেই সব কথা এইবার বলিতেছি।

সিপাহী-বিদ্রোহের যুগের এই বীরাঙ্গনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। কে না জানে তাঁহার সেই অগ্নিগর্ভ বাণী: 'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!'

আমরা সেই পুণ্যবতী মহীয়সী মহিলার জীবন-কথা আলোচনা করিয়া ধন্য হইব।

—দুই—

ঝাঁসী রাজ্যের কথা

ঝাঁসী প্রদেশের রাজধানীর নাম ঝাঁসী। বিখ্যাত আগ্রা নগরী হইতে ইহার দূরত্ব ১৪২ মাইল। এই প্রদেশের ইতিহাসে বৈচিত্র্য আছে। আলমগীর বাদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরদের মধ্যে যখন নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল, মোগলের সেই অধঃপতনের যুগে চারিদিকে অরাজকতা ও দস্যুবৃত্তির ছিল প্রাদুর্ভাব। সে সময়ের পেশোয়ার অধীন একজন মারাঠা-

কর্ম্মচারী বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এই প্রদেশটি অধিকার করেন। তিনি পেশোয়ার নিকট হইতে এই রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করিবার সনদ লাভ করেন। এই ভাবে ঝাঁসী-রাজ্য একজন মারাঠা সর্দ্দারের করতলগত হইল।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঝাঁসী-প্রদেশ দিল্লী বাদশাহের শাসনাধীনে ছিল। পরে বাহাদুর শা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি এই ঝাঁসী প্রদেশে হিন্দু রাজা ছত্রশালকে জাইগীরস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মালোয়ার মুসলমান সুবাদার ও এলাহাবাদের নবাবের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল।

ঝাঁসী-রাজ্যের পরিমাণ ৩,৬৩৪,৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা তখনকার দিনে ছিল প্রায় তিনলক্ষ। যতদিন পর্য্যন্ত পেশোয়াদের প্রাধান্য ছিল, ততদিন মারাঠা-কর্ম্মচারী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রাধান্যও ঝাঁসীতে অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার প্রভুত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বুন্দেলখণ্ড এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ রাজ্য ও প্রদেশগুলি ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হইল। ঝাঁসীও ব্রিটিশ অধিকারে আসিল। সেকালে ঝাঁসীর অধিপতিগণ 'সর্দ্দার' নামে অভিহিত হইতেন। ঝাঁসীর সর্দ্দার ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। চুয়াত্তর হাজার টাকা বার্ষিক কর ধার্য্য হইল। ঝাঁসীর প্রচলিত মুদ্রার দ্বারা সে কর দেওয়া হইত।

ঝাঁসী যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
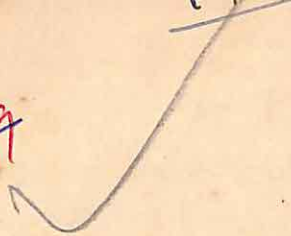
ঝাঁসীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে জলোন, সাথিয়া রাজ্য, দাতিয়া ও গোয়ালিয়র এবং ভূপাল রাজ্য। পূর্ব্বদিকে বোর্ছা রাজ্য। সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের উত্তরে ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত বাঁদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জাপুর জেলা।

ব্রিটিশ গভর্মেন্ট সর্দ্দারের এইরূপ আনুগত্য স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দিলেন এবং বংশপরম্পরা-গতভাবে এই রাজ্যের সর্দ্দারের বংশধরেরাই রাজা হইবেন, ইহাও স্বীকৃত হইল। এই সর্দ্দারের নাম ছিল রামচাঁদ-রাও বা রামচন্দ্র-রাও। রামচাঁদ-রাও সুদক্ষ রাজা ছিলেন। তিনি পনেরো বৎসরকাল মাত্র রাজত্ব করেন। রাজা উপাধি লাভের পর তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। রামচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচাঁদের মৃত্যুর পর চারি ব্যক্তি সিংহাসনের দাবীদার হইলেন—তাঁহার এক পোষ্যপুত্র কৃষ্ণরাও, দূর-সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি নারায়ণ রাও এবং শিউরাও বা শিবরাও-ভাউয়ের দুই পুত্র রঘুনাথ-রাও এবং গঙ্গাধর-রাও। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি অনুসারে শিউরাও-ভাউয়ের বংশধরেরাই সিংহাসনের অধিকারী হইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কাজেই সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঝাঁসীর রাজা হইলেন—শিউরাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ-রাও।

রঘুনাথ-রাও ছিলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। শাসনকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা একেবারেই ছিল না। রাজা রামচাঁদ-রাওয়ের সময়

ঝাঁসী রাজ্যের আয় দাঁড়াইয়াছিল বারো লক্ষ টাকা। রঘুনাথ-রাওয়ের সময় তাহা হ্রাস পাইয়া তিন লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। রঘুনাথ-রাও ভোগবিলাসে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এইজন্য বাধ্য হইয়া তিনি কয়েকখানি গ্রাম গোয়ালিয়র ও বোছ্র্ণার রাজা-মহাজনদের নিকট বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র রঘুনাথ-রাও ঝাঁসীর রাজা ছিলেন। রঘুনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক-গমন করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রঘুনাথ-রাওয়ের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন-লাভের জন্য গোল বাধিল এবং চারিজন দাবীদার দাঁড়াইল—রঘুনাথ-রাওয়ের অবৈধ সন্তান আলিবাহাদুর, রঘুনাথের বিধবা পত্নী জানকীবাই, কৃষ্ণরাও এবং রঘুনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর-রাও। সে-সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড (১৮৩৬—৪২ খৃষ্টাব্দ)। এইরূপ গোলযোগের দরুন গভর্নর-জেনারেলের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট সিংহাসনের প্রকৃত দাবীদার নির্ব্বাচিত হইয়া রাজ্যের গদিতে বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব লইলেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিবার জন্য এক কমিশন বসিল এবং বিভিন্ন দাবীদারের বিষয় আলোচনার পর ব্রিটিশ-সরকার শিবরাও-ভাউর পুত্র গঙ্গাধর রাওয়ের দাবী মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে ঝাঁসীর 'রাজা' করা হইল। ইংল্যাণ্ড হইতে কর্ত্তৃপক্ষও কমিশনের এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করায় আর কোনও গোলযোগ হইল না।

রাজা গঙ্গাধর-রাও রাজ্যশাসনের যোগ্য একেবারেই ছিলেন না। তাঁহার শাসনকালেও রাজ্যমধ্যে নানা অশান্তি, অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। কাজেই ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা আনিবার জন্য ব্রিটিশ এজেন্সীর হস্তে রাজ্য-পরিচালনার ভার দিলেন। রাজাকে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল এবং তাঁহাকে জানানো হইল যে, রাজা যতদিন রাজ্যের শাসনে ও সংরক্ষণে যোগ্যতা প্রকাশ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহার হইয়া ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিই রাজ্যশাসন করিবেন। ক্যাপ্টেন রস্ হইলেন প্রধান কর্ম্মসচিব। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সেই সুদিন আসিল। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সুশাসনগুণে রাজ্যের পূর্ব্বশ্রী যখন ফিরিয়া আসিল, রাজ্যের সমস্ত ঋণ যখন পরিশোধ হইল, সে সময়ে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বুন্দেলখণ্ডের পলিটিক্যাল এজেণ্ট উইলিয়ম হেন্‌রি শ্লীম্যান সাহেব, গঙ্গাধর-রাওয়ের সহিত যথারীতি লেখাপড়া করিয়া, বুন্দেলখণ্ডস্থিত ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ২,২৭,৪৫৮ টাকা আয়ের একটি প্রদেশ লইয়া, গঙ্গাধর-রাওয়ের হাতে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি রাজ্য-শাসনভার প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাজা গঙ্গাধর-রাও এগারো বৎসরকাল ঝাঁসী-রাজ্য শাসন করেন। রাজ্যশাসনে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলেও, তাঁহার রাজত্বকালের শেষভাগে কোনরূপ গোলযোগ বা অশান্তির উৎপত্তি হয় নাই। মোটের উপর রাজ্যের অবস্থা

শাহুর মৃত্যুর পর সাতারাতে কে মারাঠার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কোন প্রশ্নই উঠিল না। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই এ সত্য অবগত আছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাজাতির শাসন-সংরক্ষণ, রাজ্যশাসন, সমুদয়ই পেশোয়াদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মহারাজা শাহু অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। মোগল-দরবারে প্রথম জীবন অতিবাহিত হওয়ার ফলে তিনি বিলাস-ব্যসনে আসক্ত হইয়াছিলেন। শাহুর রাজত্বকালে বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট নামে কোঙ্কন দেশবাসী একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বালাজী প্রথম জীবনে জঞ্জিরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। শাহুর বিরুদ্ধাচারী বহু শত্রুকে ও বিদ্রোহী সমস্ত রাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি শাহুর প্রীতিভাজন হন এবং এজন্য শাহু তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী বা পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন। শাহু ১৭১৩ সালে রাজা হন। ছত্রপতি শাহু এই বিশ্বাসী এবং কার্য্যদক্ষ মন্ত্রীর হাতে সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজিরাওয়ের (১৭৪০-৬১ খৃষ্টাব্দ) শাসনকালে মারাঠারা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, খান্দেশ, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও নিজামরাজ্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মারাঠা-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণের মহীশূর, তাঞ্জোর এবং রাজপুতনার নৃপতিরা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে কর দিতেন।

বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হইয়াই, নরুশঙ্কর নামক একজন রণদক্ষ সেনাপতিকে বোছ্ৰারাজ্য জয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বোছ্ৰার রাজা পরাজয় মানিয়া লইলেন। অন্যান্য বিজিত রাজ্য বিভক্ত হইলে পর—নরুশঙ্কর ঝাঁসীদুর্গ রক্ষার জন্য ৮,০৫,৩৩৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর নিজের ভাগে লইবার ব্যবস্থা করিলেন। ৯,৯০,৯৯১ টাকা মারাঠা এবং বুন্দেলদের অংশে বিভক্ত হইল। বিজিত রাজ্য বর্ত্তমান বোছ্ৰা বা তিহিরি, পরগণা পাচোর ও করারর কতকাংশ সহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। বর্ত্তমান ঝাঁসী জেলা কয়েকটি গ্রাম বাদে গুরুসরাই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হইল।

নরুশঙ্কর ঝাঁসীর দুর্গের বিবিধ সংস্কার এবং ঝাঁসী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঝাঁসী রাজ্যের সহিত—পরগণা দুবোও সংযুক্ত হইল। এই দুবো পরগণা ছিল দাতিয়ার রাজ্যভুক্ত। নরুশঙ্কর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া কর্ত্তৃক পুনরায় আহূত হইলে পর তাঁহার স্থানে ঝাঁসীর সুবাদার হইয়া আসিলেন—মাধোজি গোবিন্দ। মাধোজীর পর সুবাদার হইলেন বাবুরাও কান্হাই রায়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নরুশঙ্কর পুনরায় ঝাঁসীতে আসিয়া সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। নরুশঙ্করের মৃত্যুর পর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্বাস-রাও লছমন সুবাদার ছিলেন। অতঃপর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ-রাও হরি সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া চব্বিশ বৎসরকাল স্বাধীনভাবে ঝাঁসীতে রাজত্ব করেন। পেশোয়াদের কোন প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেন

ভালই ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি জনসাধারণের কল্যাণ-চিন্তা করিতেন এবং জনহিতকর কার্য্য করার ফলে প্রজা-সাধারণের প্রিয় ছিলেন। গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকেগমন করেন। সে-সময়ে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ড্যালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে)।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট ঝাঁসীর উত্তরাধিকার-সূত্রের যে বিধান দিয়াছেন, গঙ্গাধর-রাওয়ের মৃত্যুর সহিতই ঝাঁসী-রাজ্যের উত্তরাধিকার-সূত্রের সে দাবী উপেক্ষিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহাও লর্ড ড্যালহৌসীর অনুকূল হইল। কাজেই গঙ্গাধর-রাওয়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা সিংহাসনের দাবীদার হইলেন, তাঁহাদের সকলের দাবী উপেক্ষিত হইল,—গঙ্গাধর-রাওয়ের বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই সিংহাসনলাভের জন্য পুনঃপুনঃ আবেদন-নিবেদন করিয়াও সুফল পাইলেন না। লর্ড ড্যালহৌসী অপুত্রক দেশীয় রাজ্য অধিকার (The Doctrine of Lapse) নীতির অনুসরণ করিলেন। সে বিধান এই যে, যদি দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে কেহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে কোম্পানীই হইবেন ঐ রাজ্যের অধিকারী। প্রাচীন হিন্দু-বিধানানুযায়ী যে পোষ্যপুত্র লইবার বিধান চলিয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিলেন এবং বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসী, নাগপুর (ভোঁসলা), মধ্যপ্রদেশের জয়পুর,

সম্বলপুর, সাতারা প্রভৃতি রাজ্য ঐ বিধান-বলে ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি তাঁহার পোষ্যপুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। গঙ্গাধর-রাওয়ের মৃত্যুর পর ঝাঁসীও ইংরাজ-অধিকারে আসিল। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য মাসিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

এখন পূর্ব্বের ইতিহাস আরও একটু বলিয়া লইতেছি। মারাঠাবীর মলহার-রাও হোলকার গোবিন্দরাও (ইনি গোবিন্দ পণ্ডিত এবং গোবিন্দ বুন্দেলা নামেও পরিচিত ছিলেন) চান্দেরীর রাজা দুর্জ্জনসিংহকে পরাজিত করিয়া সিঁরোজ, উদীপুর, বসোদা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যেমন অধিকার করেন, তেমনি ঝাঁসীর কাছাকাছি এক প্রান্তরে বোর্ছার রাজা অছোৎ সিংহকে পরাজিত ও নিহত করিয়া এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে রাজা ইন্দ্রগির গোঁসাই বা গোঁসাবি ছিলেন ঝাঁসী-দুর্গের শাসনকর্ত্তা। গোঁসাবি রাজা সে সময়ে মোঠ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ ১৭৩৫-১৭৪২ খৃষ্টাব্দকালমধ্যে ঘটিয়াছিল।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজিরাওয়ের মৃত্যুর পর বালাজি বাজিরাও ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে মারাঠাদের অধিপতি হইলেন। মোগল-প্রাসাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শাহু সাতারাতে ছত্রপতি হন।

নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ-রাওর মৃত্যুর পর শিওরাও-ভাউ হইলেন সুবাদার। তিনি সাধারণতঃ শিউরাও-ভাউ নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে ঝাঁসীর বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছিল ৩৬,১৬,০০৭ টাকা।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আলিবাহাদুর বুন্দেলখণ্ডের অধিকৃত রাজ্যসমূহ পুনার মারাঠাদের অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। এই সময়ে সুচতুর ব্রিটিশরাজ ঝাঁসী দুর্গের পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা ও মোঠ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রগির গোঁসাবির বংশধর রাজা হিম্মৎপান্থ গোঁসাবিরের সহযোগিতায়, আলি বাহাদুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সেই যুদ্ধে আলি বাহাদুর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহারই ফলে এলাহাবাদ হইতে ধসান পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইল। এই যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে অনেক মারাঠা ও বুন্দেল সর্দ্দারের সহিত ইংরাজের সংস্রব স্থাপিত হয়। এ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল ১৮০৩-৪ খৃষ্টাব্দকাল-মধ্যে। ইহার পূর্ব্বে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ ইংরাজের সহিত শিউরাও-ভাউয়ের এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহার ফলে শিউরাও-ভাউয়ের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাঁহার শাসনভুক্ত রহিয়া গেল। এসময়ে পুনা দরবারের প্রাধান্যও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, অন্যদিকে ব্রিটিশরাজও বিপৎকালে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। সে সময় হইতে ইংরাজ-রাজসরকার ঝাঁসী রাজ্যের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শিউরাও-ভাউয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাঁদ-রাও হইলেন ঝাঁসীর সুবাদার বা সর্দ্দার। রামচাঁদ-রাও যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প ছিল বলিয়া তাঁহার হইয়া তাঁহার মাতা সখুবাই ও রাজ্যের পুরাতন দেওয়ান রাও-গোপাল-রাও ইহাঁরাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সন্ধি হইল, সেই সন্ধিদ্বারা স্থির হইল যে, রামচাঁদ-রাওয়ের বংশধরেরা বংশপরম্পরাক্রমে ঝাঁসী-রাজ্যের অধিকার লাভ করিবেন! শুধু পরগণা মোঠ নরুশঙ্করের পৌত্র রঙ্গরাও বাজবাহাদুরের অধিকারভুক্ত রহিয়া গেল। ঝাঁসীর উপর পেশোয়াদের যে কর্ত্তৃত্বভার ছিল, তাহাও এ সময়ে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ব্রিটিশ-রাজের সহিত পেশোয়াদের যে সন্ধি হয়, সে সন্ধি অনুসারে তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রিটিশের হাতে আসিল। এইরূপে ইংরাজেরা ঝাঁসীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। রাও রামচন্দ্র রাজ্যপ্রাপ্তির পর ইংরাজদিগকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞ ব্রিটিশ-রাজসরকার ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে একটা দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া, ঝাঁসীর সুবাদারকে "মহারাজাধিরাজ" ও "ফিদবা বাদশাহা জানুজা ইংগ্রস্তান" (মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বরের একনিষ্ঠ সেবক) এই উপাধি প্রদান করেন এবং রামচন্দ্র-রাওয়ের অনুরোধে ঝাঁসীর কেল্লার উপর ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

রামচাঁদ-রাওয়ের পরবর্ত্তী রাজাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ছিলেন গঙ্গাধর-রাওয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিতা পত্নী।

—তিন—

লক্ষ্মীবাইয়ের বাল্যকাল ও বিবাহ

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর তারিখে পুণ্যতীর্থ বারাণসী-ধামে লক্ষ্মীবাই জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ ১৮ই নভেম্বর তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের পিতামহ কৃষ্ণরাও-তাম্বে নামক একজন কর্হাডে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী বাই নামক গ্রামে বাস করিতেন। পেশোয়াদের অধীনে তিনি ছিলেন একজন মামলৎদার। মামলৎদার পদ বর্ত্তমান কালের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদ-তুল্য। কৃষ্ণরাওয়ের পুত্র বলবন্ত-রাও পেশোয়াদের দরবারে একজন সেনানায়কের কাজ করিতেন। বলবন্তরাও বীর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। বলবন্তরাওয়ের দুই পুত্র ছিল। মোরোপন্ত ও সদাশিব-রাও। জ্যেষ্ঠ মোরোপন্ত পিতার নিকট পুনা নগরীতেই থাকিতেন। মোরোপন্ত পেশোয়া শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বাজিরাওয়ের ভ্রাতা চিমাজী আপ্পার একজন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বাজিরাও বিঠুরে গমন করিলে চিমাজী আপ্পা কাশীধামে গিয়া বাস করেন, মোরোপন্ত তাম্বেও

তাঁহার সহিত সপরিবারে কাশীবাসী হন। কাশীতে তিনি চিমাজী আপ্পার দেওয়ান ছিলেন।

লক্ষ্মীবাই কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যখন বয়স মাত্র তিন বৎসর, তখন তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাইয়ের মৃত্যু হয়। বিপদের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ্ আসে—মোরোপন্তের হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক চিমাজী-আপ্পাও এ সময়েই পরলোকগমন করেন। নিরুপায় মোরোপন্ত একান্ত অসহায়ভাবে কাশীতে থাকা উচিত মনে করিলেন না, তিনি বিঠুরে বাজিরাওয়ের আশ্রয়ে আসিলেন। পিতা কন্যার নাম দিয়াছিলেন মনুবাই।

মনু পিতার অসামান্য স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীনা বালিকা মনুর আবদার সবই পিতার কাছে চলিত। মনুর দিব্য-লাবণ্যময়ী গৌরকান্তি, সরল ব্যবহার এবং বাক্যালাপে বাজিরাওয়ের অনুচরেরা তাঁহাকে আদর করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'ছ্ববেলী'—ময়না। গৃহে কোন মহিলা ছিল না, কাজেই বালিকা মনুবাইয়ের বাল্যকাল পুরুষদের সঙ্গেই কাটিয়াছিল। বাজিরাওয়ের পোষ্যপুত্র নানাসাহেব ছিলেন মনুর একজন ক্রীড়াসঙ্গী। বাজিরাও যেমন পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িতে, অসিচালনা করিতে শিক্ষা দিতেন, মনুকেও সেইরূপ পুরুষোচিত ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহিত করিতেন। একদিকে যেমন শৈশব হইতেই তাঁহার অশ্বচালনা, অসিচালনা প্রভৃতিতে দক্ষতালাভ হইয়াছিল তেমনি বিদ্যাশিক্ষার দিকেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল।

নানাসাহেবকে মনুবাই আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং শুভ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসাহে ভাইফোঁটা দিয়া ভোজনে ও বসনভূষণ দানে আপ্যায়িত করিতেন।

মনুবাই সেই শৈশবেই ঘুড়ি উড়াইতে, চক্রক্রীড়া করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যখেলাও ছিল অদ্ভুত রকমের,—নিজে রাণী সাজিয়া, শৈশবসঙ্গিনীদের মধ্যে কাহাকেও সখী, কাহাকেও দাসী সাজাইতেন ; আদেশ অমান্য করিলে তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন। অসিখেলা, অস্ত্র-পরিচালনায় তাঁহার ছিল অসাধারণ আগ্রহ। পেশোয়ার পুত্রদের সঙ্গে ঘোড়া ছুটাইয়া দিতেন—নানাসাহেব ও রাওসাহেব যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইতেন, মনুবাইও তাহাদের সঙ্গে যাইতেন। কে কত বেগে অশ্বপরিচালনা করিতে পারে, কে আগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারে, ইহাই হইত তাঁহাদের লক্ষ্য। সে সময় মনুবাই যেমন খেলাধূলাতে নিত্য নূতন নূতন বিশেষত্ব দেখাইতেন, তেমনি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতিও অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। সে সময় একজন জ্যোতিষী মনুর জন্মপত্রিকাখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, একদিন এই বালিকা রাজরাণী হইবে। সেই জ্যোতির্ব্বিদের নাম ছিল তাত্যা দীক্ষিত। তখন মোরোপন্ত একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

মারাঠাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। মনুবাইয়ের বয়স

যখন আট বৎসর হইল, তখন তাঁহার পিতা মোরোপন্ত কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর-রাওয়ের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছিল। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ মোরোপন্তকে এই সংবাদ দেওয়ায় তিনি শ্রীমন্ত বাজিরাওয়ের একখানি অনুরোধপত্র সহ সেই জ্যোতিষীকে ঝাঁসী পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গাধর-রাওয়ের একজন অমাত্য আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন। সেই অমাত্যের মুখে গঙ্গাধর-রাও কন্যার অনুপম রূপ-লাবণ্য ও গুণগরিমার কথা শুনিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে (আনুমানিক এপ্রিল—মে) ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর-রাওয়ের সঙ্গে মনুবাইয়ের মাত্র অষ্টম বর্ষে মহা সমারোহের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কথিত আছে যে, গঙ্গাধর-রাওর সহিত মনুবাইয়ের বস্ত্রাঞ্চল-বন্ধনের সময় মনুবাই পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন— "দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবন্ধন করুন।" সে সময়ে এই কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

মনুবাই নববধূরূপে ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদে আসিলেন। মারাঠাদের মধ্যে রীতি আছে, নববধূ শ্বশুরগৃহে আসিলে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়। ঝাঁসী রাজপরিবারের পুরমহিলারা মনুবাইর অপরূপ লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন—"লক্ষ্মীবাই"। তিনি দেখিতে ছিলেন সত্যসত্যই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর মত। এই লক্ষ্মীবাই নামেই তিনি জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

বিবাহের আট বৎসর পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীবাই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পুত্রের জন্মলাভে গঙ্গাধর-রাও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা উৎসবের আয়োজন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পুত্রটি মাত্র তিন মাসকাল জীবিত ছিল। পুত্রের মৃত্যুতে পিতামাতা শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রশোকে গঙ্গাধর-রাওর শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকে গমন করিলেন।

গঙ্গাধর-রাও মৃত্যুর পূর্ব্বে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম দামোদর-রাও। গঙ্গাধর-রাও এই দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্মেণ্টকে তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ড্যালহৌসী তাহা মানিয়া লইলেন না। ঔরসপুত্রের অভাবে সম্পত্তি গভর্মেণ্ট অধিকার করিবেন—এই বিধানবলে বিনা গোলযোগে ঝাঁসী-রাজ্য ইংরাজেরা অধিকার করিল। গঙ্গাধর-রাওর গৃহীত পোষ্যপুত্র দামোদর-রাও অস্বীকৃত হইলেন। পতির কোন স্মৃতি থাকিবার ব্যবস্থাই রহিল না। এই অপমানে লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় শোকে, দুঃখে ক্ষোভে ও রোষে জর্জ্জরিত হইল—তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিল। তাহার কারণও ছিল। গঙ্গাধর-রাওয়ের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র-রাওয়ের সহিত ইংরাজ সরকারের কৃত সন্ধিপত্রে উল্লেখ ছিল, যে, ঝাঁসীর মালিকীসত্ত্ব বংশপরম্পরা-

ক্রমে বজায় থাকিবে। এখন তাহা উপেক্ষিত হইল বলিয়া রাণীর মনে দুঃখের এবং কষ্টের কারণ হইয়াছিল। সে সব বিষয় আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দামোদর-রাও সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। লক্ষ্মীবাই এ সময়ে পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু রাজতহবিলে উপযুক্ত অর্থ না থাকায়, কোম্পানির সরকারে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সে টাকার মধ্য হইতে লক্ষ্মীবাই একলক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে জানাইলেন যে,—"দামোদর-রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ টাকার দাবী করিলে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন—লক্ষ্মীবাই যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন এবং চারিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জামিনদার করিতে পারেন তবে তাঁহাকে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।" রাণী বাধ্য হইয়াই এই অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন। প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর-রাওর উপনয়নকার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

গঙ্গাধর-রাওর মৃত্যুর পর প্রায় তিন বৎসরকাল লক্ষ্মীবাই কঠোর ব্রতাচরণ, শিবপূজা ইত্যাদি দেবকার্য্য করিতেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় আপনার মনের দুঃখ-বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি চারিটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া আতরমিশ্রিত সুগন্ধি শীতল জলে স্নান সমাপনপূর্ব্বক শুভ্র চান্দেরী শাড়ী পরিয়া পূজা করিতে

বসিতেন এবং বেলা আটটার সময় পূজা শেষ করিয়া উঠিতেন। সর্ব্বপ্রথমে স্বামীর মৃত্যুর পর মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেবতার পায়ে গঙ্গাজল অর্পণ করিতেন ও পরে তুলসীসেবা করিতেন—তারপর আরম্ভ হইত পার্থিব পূজা। দরজায় গায়কগণ সমস্বরে ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিতেন, তারপর পুরাণপাঠক পুরাণপাঠ করিয়া রাণীকে শুনাইতেন। তৎপর রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে কয়েকটি তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাণী ব্যায়াম করিতেন। এইবার দানধর্ম্ম, ব্যায়াম, এগার শত বার ইষ্টনাম লিখন, পুরাণশ্রবণ, দর্শনপ্রার্থীদের দর্শন-দান ও আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শয়ন করিতেন। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্ববিধ শোকদুঃখ দমন করিয়া রাজকুললক্ষ্মীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন। সহসা কোন ব্যাপারেই তিনি উদ্দীপ্ত হইতেন না। ধীর ও শান্তভাবে সব দিক্ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতেন। কিন্তু ইংরাজের দুর্ব্ব্যবহারে একদিন এই মহীয়সী মহিলার হৃদয়েও জ্বলিয়া উঠিল বিদ্রোহের আগুন।

ঝাঁসীর রাণীকে গভর্মেণ্ট হইতে মাসিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তিদান করা হইত। এই অর্থ যে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে অত্যন্ত অল্প, সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই কারণ ছিল না। সে অর্থে তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহ হইত না; তাই তিনি তাঁহার নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে ব্যয়সংকুলান করিতেন। লক্ষ্মীবাই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী ও

একজন ইউরোপীয়কে ৬০০০০৲ টাকা দিয়া এবং তৎসঙ্গে দরখাস্ত দিয়া বিলাতের কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ দরখাস্তের মধ্যে লিখিত ছিল যে, ইংরাজ সরকার ঝাঁসী-রাজ্যকে খাস করিলেন কোন্ অধিকারে? পেশোয়ার রাজত্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক বীরত্বের পরিচয় দিয়া নিজ নিজ বাহাদুরীর দ্বারাই উহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উহাতে ইংরাজের কোন অধিকার নাই। ইহাও রাণীর ক্ষোভের এক প্রধান কারণ ছিল। তারপর দামোদরের উপনয়ন উপলক্ষে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য করিতে গিয়া যে অপমানজনক সর্ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক হইয়াছিল।—দরখাস্ত লইয়া, ঐ দুই মোক্তার বিলাতে গিয়া যে কি করিলেন তাহার কিছুই জানা যায় নাই।

ঝাঁসী হিন্দুরাজ্য। গোবধ সেখানে নিষিদ্ধ। ইংরাজ-কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে গোহত্যার দরুনও তাঁহার বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। রাণীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা এই অন্যায় কার্য্য রহিত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। ঝাঁসীর জনসাধারণ ইংরাজ সরকারের কাছে এই বিষয়ের প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু সকল আবেদনই প্রত্যাখ্যাত হইল।—ইহার পর গভর্মেণ্ট হইতে রাণীকে তাঁহার স্বামী গঙ্গাধর-রাও কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণপরিশোধের জন্য আদেশ দেওয়া হইল। রাণী এই অন্যায় আদেশের

প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে, স্বামীর ঋণের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা সঙ্গত নহে—তিনি ত আর ঋণ করেন নাই।

ইন্দোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া গভর্মেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কোনও প্রতিকার করিলেন না। রাণীর মাসিক বৃত্তি হইতে কিয়দংশ হ্রাস করা হইল। এইরূপভাবে ব্রিটিশরাজের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ অনুদার ব্যবহার পাইয়া ইংরাজ গভর্মেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। তারপর সহসা একদিন রাণীর অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি সুযোগ পাইয়া বাহিরে ভীষণ অগ্নিপ্লাবনের সৃষ্টি করিল।

—চার—

ঝাঁসীর সহর ও দুর্গ

রাণী লক্ষ্মীবাই রাজধানী ঝাঁসী সহরেই বাস করিতেন। কলিকাতা হইতে ঝাঁসীর দূরত্ব ৭৯৯ মাইল, আর বোম্বাই হইতে ৭০২ মাইল। ঝাঁসী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথের উপর অবস্থিত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসী সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ-অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে ইহার জনসংখ্যা ছিল ৫৩,৭৭৯ জন।

বোর্ছার রাজা বীরসিংহ রাজদেও ঝাঁসী সহর প্রথম স্থাপন করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে বাঁগরা নামে এক ছোট পাহাড়ের উপর তিনি এক 'গড়হি' বা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তখন ঝাঁসী ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ক্রমশঃ উহার চারিদিকের লোকজনের বসতির সহিত নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ঝাঁসী নামের সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন গোর্ছার রাজা বীরসিংহ-দেও এবং জৈতপুরের রাজা একসঙ্গে বসিয়া ছিলেন। বীরসিংহ-দেও তাঁহার নবনির্ম্মিত দুর্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জৈতপুরের রাজাকে বলিলেনঃ আপনি কি এখান থেকে আমার নূতন দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন?

জৈতপুরের রাজা উত্তর করিলেনঃ ঝাঁসী—মানে ঝাপসা দেখাচ্ছে। সেই ঝাঁসী হইতেই নগরের নাম হইল ঝাঁসী।

আমরা পূর্ব্বে নরুশঙ্কর রাওর কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পর প্রকৃতপক্ষে নরুশঙ্কর ঝাঁসী দুর্গ ও সহরের বিবিধ উন্নতি করেন। তাঁহার পর মাধোজী গোবিন্দ আতিয়াও অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

ঝাঁসী সহরের চারিদিক্ প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় সাড়ে তিন মাইল। প্রাচীরবেষ্টিত সহরের পরিমাণ হইবে এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান। নগরপ্রাচীরের গায়ে নগরে প্রবেশের জন্য দশটি দরোজা আছে। সেই সব তোরণ-দ্বারের নাম—খণ্ডেরাও, দাতিয়া, উনাও, ভাণ্ডীর, বড়গাঁও, লক্ষ্মী, সগর, বোর্ছা, সইনর এবং ঝির্নান দরোজা।

এই সকল দরোজার মধ্যে ভাণ্ডীর দরোজা সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ এবং ঝির্নান দরোজা সম্পূর্ণভাগে মুক্ত আছে। এখনও ঐ সমুদয় দরোজার কাঠের কপাট ইত্যাদিতে তোপের গোলার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আশে-পাশে রহিয়াছে পুলিশের ফাঁড়ি ও থানা।

এই প্রধান দশটি নগরপ্রবেশ-তোরণ ব্যতীত চারিটি খিড়কী দরোজা আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে—গঙ্গাপতগির খিড়কি, অলিঘোলকি খিড়কি, সুজনকি খিড়কি ও সগর খিড়কি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে স্যার হিউ-রোজ তাঁহার তোপশ্রেণী সইনর এবং ঝির্নান দরোজার মধ্যে সজ্জিত করেন। সেই অংশ এখনও সংস্কৃত হয় নাই।

ঝাঁসীদুর্গ এক সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল—এখনও তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই দুর্গ বিদ্রোহীদের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মেজর এলিস্ সাহেব যখন ঝাঁসী রাজ্য খাস করিবার আদেশলিপি ও ঘোষণাপত্র লইয়া ঝাঁসী আসেন, সেই ঘোষণা-পত্রের মধ্যে ইহাও ছিল, রাণী রাজবাটীতে থাকিবেন, কিন্তু কেল্লার মধ্যস্থ রাজবাটী ও সমস্ত কেল্লা ইংরাজ-সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সেই সময় হইতে ঝাঁসীর দুর্গ ইংরাজ অধিকারে ছিল।

—পাঁচ—

"দিল্লী চলো!"

রাণী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ অনুদার ব্যবহার পাইয়া, অবশেষে ঝাঁসী ত্যাগ করিয়া বারাণসীধামে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা কোম্পানীর রেসিডেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে বাসনাও পূর্ণ হয় নাই। এইরূপে সর্ব্ববিধ বিষয়ে কোম্পানীর অনুদার ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত তিক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাইয়ের মনের কোণে ইংরাজদের প্রতি যে বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা এক সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল।

লক্ষ্মীবাই যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, সেইরূপ ছিল তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিবার দক্ষতা। কমিশনার বা গভর্ণরের নিকট তিনি বিনা দ্বিধায় অতি সুন্দর ভাবে কথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যকৌশল ও কূটবুদ্ধির পরিচয় ইংরাজ-রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন।

লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পর ভাইকাউণ্ট ক্যানিং বড়লাট হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের এক বৎসর না যাইতেই ভারতবর্ষে সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ বঙ্গদেশে এক ভয়ঙ্কর অশান্তি উপস্থিত হইল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা অশান্তির ভাব চলিতেছিল। একটি একটি করিয়া তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া দেশীয় রাজারা মনে মনে অসন্তোষের ভাব পোষণ করিতেছিলেন। প্রত্যেকেরই মনে মনে সর্ব্বদা ঐরূপ আশঙ্কা ছিল—বুঝি এইবার আমার পালা আসিল। তারপর জমিজমা সম্বন্ধে নূতনরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, প্রজাদের উপর জমিদারদিগের পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রভুত্ব ছিল না। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুলভ ডাকমাশুল, স্কুল, হাসপাতাল—এই সকল নূতন নূতন সংস্কার ও উন্নতিতে দেশের লোকেরা অনেকেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। দেশের হিতজনক এই সব সংস্কারকে জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া মনে করিত যে, ইংরাজরা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে এই সব ব্যবস্থা করিতেছে। এইভাবে নানা সত্য ও অসত্য কথা বাঙ্গালা ও অযোধ্যায় সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইল।

এই সময়ে সৈন্যদিগকে এন্‌ফিল্ড রাইফেল নামক নূতন ধরণের বন্দুক প্রদান করা হয়। এই বন্দুকে মোম বা চর্ব্বির কার্ত্তুজ বা টোটা ব্যবহৃত হইত। ঐ টোটা বন্দুকে ভরিবার সময় দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। এইরূপ

গুজব রটিয়া গেল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য এই টোটাতে গোরুর ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরে কিন্তু অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহাদের ঐরূপ অনুমান অসত্য ছিল না; ঐ কার্ত্তুজ তৈয়ারী করিতে শূকর ও গোরুর চর্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সে-সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ঝাঁসীতেও ঐরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল। ঝাঁসী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল যে, কোম্পানী বাহাদুর আটা ও ময়দার সহিত গোরুর হাড় চূর্ণ মিশাইতেছেন এবং গোরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত কার্ত্তুজ ব্যবহার করিবার জন্য সিপাহীদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। এ-কথাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, দুই রেজিমেণ্ট সিপাহীকে কলিকাতায় চালান করিয়া নিহত করা হইয়াছে।

প্রথমেই বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাহাদের ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু সে বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইয়াছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের ইংরাজ সেনাধ্যক্ষদিগকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়-দিগকে হত্যা করিল এবং দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল।

দিল্লীর মুসলমানরা বিদ্রোহী সেনাদের সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ্ বাহাদুর শাহকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড এবং ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্রোহের বহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। এই সকল বিদ্রোহী সিপাহীরা সব স্থানেই ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে লাগিল ; জেলের কয়েদীগণকে মুক্ত করিয়া দিল ; খাজনাখানা লুঠ করিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি এবং ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানেও বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহী সৈন্যদের কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল : 'দিল্লী চলো ভাইয়া—দিল্লী চলো।'

—ছয়—

ঝাঁসীতে আগুন জ্বলিল

বিদ্রোহের আগুন দিল্লী, কানপুর, মধ্যভারত, ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানে এবং দেশের সুদূর প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের একটি প্রধান আড্ডা হইল কালপি বা কল্পি (Kalpi)। ইংরাজ-শাসনকর্ত্তারা নিজ নিজ শাসনভুক্ত নগর ও জেলার শাসন-সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ নিজ প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিকে অরাজকতা ও পৈশাচিক অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিল। দীন প্রজাগণ অসহায়

হইয়া পড়িল এবং দলে দলে নগরবাসীরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাইবার জন্য ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

তাত্যা-টোপে বিদ্রোহের আগুন ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার জন্য নানা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সত্ত্বেও বহুকাল পর্য্যন্ত ঝাঁসীতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত হয় নাই। রাজ্যের কি সেনা, কি প্রজা, কেহই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিতে অগ্রসর হয় নাই। মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বয়স তখন তেইশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী, উদার এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণা। তাঁহার মনে হইল, এই বিদ্রোহের পরিণাম অবশেষে অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে। এজন্য তিনি মনের বিবিধ অশান্তি ও উত্তেজনার ভার সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত অতি দূরে অবস্থান করিতে-ছিলেন।

ঝাঁসীতে সে সময়ে দ্বাদশসংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একাংশ, চতুর্দ্দশসংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিগণের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক অবস্থান করিতে-ছিল। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন ডন্‌লপ্। যেদিন ঝাঁসী ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেদিন হইতেই ক্যাপ্টেন স্কিন্ কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের মনে কোন দিন এমন আশঙ্কা হয় নাই যে, ঝাঁসীতেও বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত হইতে পারে।

ঝাঁসীর দুর্গ একদিকে যেমন স্বাভাবিকভাবেই সুরক্ষিত ছিল, তেমনি স্থাপত্য-বিদ্যার কৌশলে এবং দুর্গ-পরিখার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যগুণে ঝাঁসী দুর্গ সে-সময়ে উত্তর-ভারতে দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিচিত ছিল। একটি উচ্চ পর্ব্বতোপরি দুর্গটি অবস্থিত ছিল। দুর্গের উপর হইতে সহর ও চারিদিকের পল্লী ও জনপদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার পক্ষে ঝাঁসী দুর্গ ছিল সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক। দুর্গের প্রাচীর স্থানে স্থানে যোল ফুট ও কুড়ি ফুট দৃঢ় প্রস্তরের গাঁথুনির দ্বারা গঠিত ছিল। বাহিরের দিকেও দুর্গ বেষ্টন করিয়া প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের গায়ে ও বাহিরের নগরপ্রাচীরে গোলাগুলি নিক্ষেপের রন্ধ্র ছিল। কয়েকটা উচ্চ বুরুজ ছিল, সেই উচ্চ স্তম্ভের উপরও কামান সজ্জিত থাকিত। দুর্গের চারিদিক্ বেড়িয়া ছিল ঝাঁসী সহর। শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ছাড়া, সহরের চারিদিক আঠারো হইতে ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। দুর্গের পশ্চিমদিক্ দুরারোহ শিলাকীর্ণ পর্ব্বত-বেষ্টিত থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গ ছিল সুরক্ষিত। দুর্গটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য—সহরটিও তেমন ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। দুর্গের দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের কিয়দংশ ব্যতীত আর সকলদিকেই ঝাঁসীনগরী প্রসারিত ছিল।

ঝাঁসীর ন্যায় নিরাপদ্ স্থানে অবস্থান করিয়া এবং ঝাঁসীর রাণীর ব্যবহারে কোনরূপ সন্দেহের কারণ দেখিতে না পাইয়া, ক্যাপ্টেন স্কিনের নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছিল যে,

ঝাঁসী দুর্গের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবে না কিংবা বাহিরের লোকেরা আসিয়াও সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

ক্যাপ্টেন স্কিন্ ১৮ই মে তারিখে আগ্রাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে জানাইয়াছিলেন: 'ঝাঁসীতে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না; বরং এই দুর্গের সিপাহীরা মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীগণের বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। বিশেষ, এখানে ক্যাপ্টেন ডন্‌লপের ন্যায় উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষ রহিয়াছেন।' কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা সত্যে পরিণত হইল না, ৪ঠা জুন ঝাঁসীর সেনাদের মধ্যেই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ৫ই জুন সৈনিক-নিবাসের কয়েকখানি বাঙ্‌লো-ঘর পুড়িয়া গেল, বন্দুকের ধ্বনিতে দুর্গের চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরের অধিবাসীরা নিজ নিজ পরিবার ও ধন-সম্পত্তি লইয়া দুর্গের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। সিপাহীদের অধিনায়কগণ সেনা-নিবাসেই রহিলেন এবং তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহীরা ডন্‌লপ সাহেবকে হত্যা করিল এবং ছাউনীর অর্থভাণ্ডার ও গোলাবারুদ অধিকার করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয় অধিনায়ক ও অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই উন্মত্ত সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। কেবল একজন

সৈন্যাধ্যক্ষ কোনরূপে অশ্বারোহণ করিয়া দুর্গে গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন।

এদিকে বিদ্রোহী সিপাহীগণ কারাগার হইতে কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া দিল, সরকারী দপ্তরখানা পোড়াইয়া ফেলিল। তখন কারামুক্ত কয়েদীর দল, সরকারী প্রহরীরা সকলে মিলিত হইয়া ঝাঁসীর দুর্গ অবরোধ করিল।

—সাত—

ইংরাজের বিপদ—রাণীর সাহায্যদান

কমিশনার ক্যাপ্টেন স্কিন্ এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাহায্যের জন্য সহরের বিশ্বস্ত সর্দ্দারদের নিকট পত্র লিখিলেন এবং দুর্গ হইতে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গুপ্তপথে কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে রাজপ্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন। রাণী, স্কিন্ ও গর্ডন সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাদের ও দুর্গের অধিবাসিগণের জন্য তিন মণ আটার রুটি এবং ডাল-শাক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া গুপ্ত ভাবে দুর্গের ভিতরে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন। রাণীর অবস্থাও এ-সময়ে অত্যন্ত সঙ্কটজনক ; তাঁহার নিকট তখন মাত্র

একশত সৈনিক ছিল। তাহাদেরও মহানুভবা রাণী ইংরাজদের সাহায্যের জন্য দুর্গের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

এ বিষয়ে কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন, ৭ই জুন প্রত্যুষে যখন ক্যাপ্টেন স্কিন্ দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য লক্ষ্মীবাইয়ের নিকট কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা পথের মধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রাণীর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দানের পরিবর্ত্তে উত্তেজিত সিপাহীদের হাতে সমর্পণ করেন। ফলে সিপাহীদের হাতে তাহাদের প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। নিরুপায় স্কিন্ ও গর্ডন সাহেব ঐ দিন বার বার সংবাদ পাঠাইয়া ও পত্র প্রেরণ করিয়াও রাণীর নিকট হইতে কোনও প্রতিকার পাইলেন না। কথা হইতেছে, রাণীর নিকট তাঁহাদের লিখিত পত্র পৌছিয়াছিল কি না, তাহাই ছিল সন্দেহজনক। অনেকে বলেন, রাণী ক্যাপ্টেন স্কিন্ ও গর্ডনের প্রেরিত লোকদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মিথ্যা অপবাদ রাণীর সম্বন্ধে চলিয়া আসিয়াছে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। দুই-একজন ইংরাজ লেখক ব্যতীত লক্ষ্মীবাইয়ের দেশীয় জীবনী-লেখকেরা কেহই এরূপ অলীক অপবাদের কথা উল্লেখ করেন নাই। এজন্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়, রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের উপর আরোপিত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৮ই জুন এক ভীষণ দিন। এই দিন প্রাতঃকালে

সিপাহীরা পরম উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিল। ৭ই জুন বেলা দুই ঘটিকার সময় হইতে এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই আক্রমণে দুর্গমধ্যস্থিত ইউরোপীয়গণ একান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

৮ই জুন তারিখে দলের পর দল বিদ্রোহী সৈনিকেরা অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইংরাজদের বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ওদিকে দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত বিদ্রোহী দলের সহকারিগণ—বিদ্রোহীরা যাহাতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, সে জন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দুর্গমধ্যস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষগণের সতর্ক-দৃষ্টির ফলে তাহা কিছুকালের জন্য সম্ভবপর না হইলেও, আক্রমণকারিগণ গোলার পর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্যাপ্টেন গর্ডন আক্রমণকারীদের গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইউরোপীয়দের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ভীষণ রবে চারিদিকে ভীতি উৎপাদন করিয়া দলে দলে বিদ্রোহীরা আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দুর্গমধ্যে খাদ্য-সামগ্রী নাই, গোলাগুলি নাই—কি ভাবে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়! তখন দুর্গমধ্যস্থিত ইউরোপীয়েরা বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিল। ক্যাপ্টেন স্কিন্ সন্ধিপ্রার্থী হইয়া দুর্গের উপর শ্বেতপতাকা উড়াইয়া দিলেন।

—আট—

বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য—নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বিদ্রোহী সিপাহীদের অধিনায়কগণ দুর্গের উপর শ্বেতপতাকা উড়িতে দেখিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্যাপ্টেন স্কিন্ সন্ধিস্থাপনের জন্য যে সম্মত, তাহা দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন বিদ্রোহী-দলের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন দেশীয় ডাক্তার—ডাক্তার সালে মুহম্মদ, ক্যাপ্টেন স্কিন্‌কে বলিলেন : যদি ইউরোপীয়েরা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট দুর্গ সমর্পণ করেন, তবে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না।

এ প্রস্তাব মানিয়া লইয়া—দুর্গবাসী ইংরাজেরা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ ছাড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিদ্রোহীরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিয়া এবং অস্ত্রত্যাগ করিয়া দুর্গদ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই রক্তলোলুপ সশস্ত্র বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিল।

বন্দী করিয়াই কি তাহারা ক্ষান্ত রহিল? তাহা নহে, তাহাদিগকে ঝাঁসীর প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া নগরের বাহিরে বৃক্ষশ্রেণীর নিকট শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখা হইল,

তাহার পর সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া জেলের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিশ্বস্ত জেল-দারোগার হস্তে সমর্পণ করা হইল। এই দারোগার প্রতি ইউরোপীয়দের অগাধ বিশ্বাস ছিল, এবং সে যে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ইংরাজদের একান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইল। দারোগা সর্ব্বপ্রথম তাহার পূর্ব্বতন মনিবের প্রাণসংহার করিল। মহিলাদিগকে এবং শিশু ও বালক-বালিকাদিগকে পুরুষদের নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইল। ইহাদের সকলকেই একে একে ঘাতকদিগের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইল। হতভাগ্য নরনারীগণের মৃতদেহ তিন দিন পর্য্যন্ত সাধারণ রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইল। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন নিরপরাধ মানুষের শোণিতে ঝাঁসী কলঙ্কিত হইল। দুইটি অগভীর কবর খুঁড়িয়া তাহার একটিতে পুরুষদের এবং অন্য একটিতে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের কোন প্রকারে গোর দেওয়া হইয়াছিল। ঝাঁসী পুনরায় ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হইলে পর প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ধর্ম্মযাজক মিঃ শবে (Mr. Schawabe) এবং স্যর-হিউ-রোজের সৈন্যদলভুক্ত রোমান্-ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মিঃ ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ড (Mr. Strickland) মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কোনরূপ ষড়যন্ত্র ছিল কি না পরিষ্কারভাবে সে-বিষয়ে কিছুই জানা যায় নাই। কে সাহেব বলেন: আমি বেশ বিশ্বস্তসূত্রেই

জানিতে পারিয়াছি যে, এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে রাণীর কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। আমার মনে হয়, প্রধানতঃ আমাদের পুরাতন ভৃত্যদের দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল। অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্ত্তৃক এই অতিশয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আমাদের জেল-দারোগাই ছিল এ-কার্য্যের অগ্রণী।

অস্ত্রহীন শরণাগত ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহীরা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার দরুন ঝাঁসীর রাণীর নামেও অযথা কলঙ্কের আরোপ করিতে কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রাণী এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতেই ঐরূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস-প্রণেতা জি. বি. মেলিসন্ (G. B. Malleson) তাঁহার গ্রন্থে রাণী এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

মেলিসন্ সাহেব এ বিষয়ে লিখিয়াছেনঃ ঝাঁসীর এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রাণীর কতটা হাত ছিল, তৎসম্পর্কে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন স্কিনের প্রেরিত তিনজন কর্ম্মচারীকে যে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহাও রাণীর ষড়যন্ত্রেই হইয়াছিল, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে; কেননা ইহার দ্বারা রাণীর লাভবান হইবারই ছিল অধিক সম্ভাবনা। ইংরাজদের হাত হইতে মুক্তিলাভ এবং

স্বাধীনভাবে ঝাঁসীর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার একান্ত কাম্য। বুদ্ধিমতী রাণী সিপাহীদিগকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া —রাণী হইবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন 'রাণী' উপাধি, তিনি চাহিয়াছিলেন নিজ নামে মুদ্রা-প্রচার, তিনি চাহিয়াছিলেন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা। অর্থলোলুপ বিদ্রোহী সিপাহীরা ঝাঁসীর রাণীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ না পাইলে মৃত রাজার অবৈধ পুত্র সদাশিব রাওকে ঝাঁসীর গদীতে বসাইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাও যে রাণীর বিদ্রোহীদলকে সহায়তা করার অন্যতম কারণ হইতে পারে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সিপাহীযুদ্ধের অন্যতম ঐতিহাসিক কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত রাণীর কোন সম্রব ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এইরূপ। সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত উত্তেজিতভাবে দলে দলে আসিয়া ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল। দলের অধিনায়ক রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবী করিল। অসহায়া রাণী লোক-মারফত তাহাদের জানাইলেন, তাঁহার তহবিলে তিন লক্ষ টাকা নাই, কোথা হইতে কি ভাবে তিনি টাকা দিবেন?

বিদ্রোহীদের নেতা জানাইল—টাকা দিলে আমরা রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিব না, আমরা দিল্লী চলিয়া যাইব; নতুবা সদাশিব-রাওকে ঝাঁসীর গদিতে বসাইব। টাকাই আমাদের

প্রয়োজন, টাকা না পাইলে তোপের মুখে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিব। রাণী তাহাদের এইরূপ উক্তিতেও ভীতা না হইয়া তাঁহার পিতা মোরোপন্তকে তাঁহার অবস্থা বেশ ভালভাবে বুঝাইয়া বলিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা মোরোপন্তের কোন কথাই শুনিল না, তাহারা মোরোপন্তকে বন্দী করিল।

অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী দলের সর্দ্দারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিপাহীরা টাকা পাইয়া তাঁহার পিতাকে মুক্তি দিল এবং প্রফুল্লমনে "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাকো অম্মল রাণী লক্ষ্মীবাইকা"—দেশ ভগবানের, দেশ বাদশাহের, রাজত্ব রাণী লক্ষ্মীবাইএর অর্থাৎ খোদার মুলুক, বাদশার মুলুক, রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের আমল! এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে দিল্লী-অভিমুখে চলিয়া গেল।

এইরূপ একটা ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঝাঁসী-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্মীবাইয়ের শাসনাধীনে আসিল।

সিপাহীরা চলিয়া গেলে পর লক্ষ্মীবাই গভর্মেণ্টের নিয়োজিত ফৌজদারী সেরেস্তাদার, ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ গোপাল-রাওয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং সগর (Sagar) প্রদেশের কমিশনারের নিকট ঝাঁসীতে যাহা ঘটিয়াছিল সে সমুদয় বিষয় বিবৃত করিয়া পত্র দিলেন; এবং ঝাঁসীর সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়েও পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন। সে-সময়ে সগর প্রদেশে কোনরূপ অশান্তির

কারণ ঘটে নাই। রাণীর পত্র পাইয়া তাঁহারা সতর্ক হইয়া গেলেন, সেখানে আর বিদ্রোহ ঘটিতে পারিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনা হইতেই ঝাঁসী-রাজ্যের শাসনসংরক্ষণের ভার সম্পূর্ণভাবে রাণীর হাতে আসিয়া পড়িল।

এই সময়ে রাণী তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজ্যের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রথমেই সৈন্যদলের সংগঠনে ও তাহার সর্ব্ববিধ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ-প্রাসাদ দৃঢ়ভাবে সংস্কৃত হইল। নূতন অস্ত্রাগার, বারুদখানা নির্ম্মিত হইল। টাকশাল নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রা তৈয়ারী ও প্রচার করিতে লাগিলেন। দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি কামান এবং রাজপ্রাসাদ-মধ্যে লুক্কায়িত চারিটি কামান বাহিরে আনিলেন এবং দুর্গ ও প্রাসাদের উপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া রাখিলেন। রাণী চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দুদুপন্ত, নানাসাহেব প্রভৃতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারদের আহ্বান করিয়া এক দরবার করিলেন। সর্দ্দারেরা ঝাঁসীতে সমবেত হইয়া ইংরাজ গভর্মেণ্টের আনুগত্য রক্ষা করিয়া রাণীকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণের ফলে ঝাঁসীতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণীর আধিপত্য-গ্রহণে ক্রুদ্ধ হইয়া সদাশিব-রাও নারায়ণও ঝাঁসী

অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং করেরা নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিলেন। পরে কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া সদাশিব আপনাকে 'ঝাঁসীর রাজা' বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীবাই তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া করেরা দুর্গ অবরোধ করিলে পর সদাশিব গোয়ালিয়রে সিন্ধের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ঝাঁসী আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার সদাশিব ঝাঁসী আক্রমণ করিলে পরাজিত ও বন্দী হন।

—নয়—

নথে-খাঁর আক্রমণ

ব্রিটিশ প্রভাব বিলুপ্ত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজা ও নবাবেরা ঝাঁসীর রাণীকে অসহায়া মনে করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হন। তাঁহাদের মধ্যে তেহরীর বা বোরছার নবাবের দেওয়ান নথে-খাঁ ঝাঁসী আক্রমণ করিলে রাণী যে অদ্ভুত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না।

নথে-খাঁর সঙ্গে ছিল কুড়ি হাজার সৈন্য। এ সময়ে রাণীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না। তথাপি তিনি ভীতা না

হইয়া নথে-খাঁর আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে রাণীর দরবারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহই যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। মন্ত্রী লক্ষ্মণরাও এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ কেহই এইরূপ বিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন দেওয়ানের অধীনতা মানিয়া লইয়া সন্ধি করিতে; কিন্তু তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা রাণী কোনরূপেই এই হীনতা ও দীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন: সিংহিনী কি কখনও ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীতা হয়ে আত্মসমর্পণ করতে পারে? সে কি কখনও সম্ভব! তোমরা পুরুষ হয়ে কোন্ মুখে এরূপ হীন প্রস্তাব সমর্থন কর? তোমরা কি ভুলে গেলে যে, মহিষমর্দ্দিনী দেবী চণ্ডিকার অংশভূতা নারীশক্তি—বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে পারে না? অসম্ভব সে কথা! মন্ত্রিগণ, সর্দ্দারগণ সকলে এই বীরাঙ্গনার সাহস ও নির্ভীকতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারাও অবশেষে রাণীর মতে মত দিলেন। ঝাঁসীর রাজ্যের সৈন্যগণ যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তাঁহার সখী ও সঙ্গিনী চম্পা ও মুন্দরা এবং অন্যান্য পুরনারীগণও পুরুষের বেশে রণসাজে সজ্জিতা হইলেন। সকলের হাতে শোভা পাইল উন্মুক্ত কৃপাণ। সকলে চড়িলেন রণ-অশ্বে। রাজপুরীর অনেক মহিলাই রণসাজে সাজিলেন। একদল নারীসৈন্যবাহিনী গঠিত হইল।

রাণীর নিকট হইতে নথে খাঁ দূতমুখে সংবাদ পাইলেন:

ঝাঁসী এখন আমার নিকট ইংরাজ কোম্পানীর গচ্ছিত রাজ্য। দ্বিতীয়তঃ আমি সহায়হীনা বিধবা, আপনার কর্ত্তব্য এই দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য করা, তাহা না করিয়া আপনি আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা কি বীরের ধর্ম্ম ?

নথে-খাঁ রাণীকে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন: আপনি ইংরাজদের নিকট হইতে যে বৃত্তি পান, সেই পরিমাণ টাকা আমি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছি—আপনি ঝাঁসীর রাজ্য ও দুর্গ বিনা দ্বিধায়, বিনা যুদ্ধে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

লক্ষ্মীবাই নথে-খাঁর এইরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে ক্রুদ্ধা হইলেন এবং যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন।

তিনি দেওয়ান কুমার জওহর সিংহকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ললাটে পরাইয়া দিলেন বিজয়-তিলক, হাতে পরাইয়া দিলেন বীরবলয় বা রণকঙ্কণ। বীর জওহর সিংহ সেনাপতির পদে বরিত হইয়া মহা উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধযাত্রার জন্য সৈন্য-সাজ করিতে লাগিলেন। রাজা গঙ্গাধর-রাওয়ের একজন অতি বিশ্বস্ত ও কৌশলী গোলন্দাজ ছিলেন তাঁহার নাম গোলাম গোস্।

গোলাম-গোস্ এক সময়ে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গো[illegible]ার [illegible]রিল। কিন্তু অনেককাল সে-কার্য্যে বিরত ছিলেন। এর[illegible] দিলেন আদেশে প্রবীণ গোসখাঁ আবার নবীন উৎসাহে[illegible]ন প্রস্থান সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘনগর্জ্জ, মহাকু[illegible] রণনৈপুণ্যের

শত্রুসংহার, নলদর, কড়ক, বিজলী নামক তোপগুলি পুনরায় পরিষ্কৃত ও ব্যবহারের যোগ্য হইয়া—বুরুজের উপর সজ্জিত হইল।

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নেত্রীত্বে পুরুষ-সেনাবাহিনীর সঙ্গে নারীসেনাও নথে-খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণসাজে সাজিল। পেশোয়ার ভগোয়া ঝাণ্ডা, ব্রিটিশের ইউনিয়ান জ্যাকের সহিত সম্মিলিত ভাবে দুর্গের ও প্রাসাদের সু-উচ্চ স্তম্ভের উপর পেশোয়া আমলের পতাকা পত্ পত্ শব্দে উড়িতে লাগিল। স্বয়ং রাণীসাহেবা পাঠানী বেশ ধারণ করিয়া কেল্লার প্রধান বুরুজের উপর উপস্থিত থাকিয়া রণসজ্জার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কর্ত্তব্য:পরায়ণা রাণী—ঝাঁসীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা শ্রীগোপালরাও লণ্ডাটের দ্বারা সবিস্তারে লিখাইয়া মধ্যভারতের এজেণ্ট স্যর-রবার্ট-হেমিল্টনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নবনিযুক্ত অযোগ্য দেওয়ান একজন অকর্ম্মণ্য অকৌশলী কর্ম্মচারীর দ্বারা এই পত্র প্রেরণ করিবার ফলে ফলিল বিপরীত ফল। ঝাঁসী ছিল ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন। ইন্দোর যাইবার পথে সেই পত্রবাহক নথে-খাঁর লোকদের দ্বারা ধৃত হইল। নথে-খাঁ রাণীর পত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে 'খরিঠা' (পত্র) জানাইয়া ঝাঁসীর রাণীর সম্পর্কে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া এজেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাণীর

অদৃষ্টাকাশে দেখা দিল প্রলয়ের ধ্বংসলীলার ঘোর ঘনঘটার প্রকাশ। সে কথা পরে বলিতেছি।

নথে খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রবল সেনাদল বন্যার প্লাবনের মত ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সেনাদলকে অক্রমণ করিল। নথে-খাঁ জানিতে পারিয়াছিলেন, রাণীর সৈন্যসংখ্যা অল্প। কাজেই অল্পসংখ্যক সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করা সম্ভব—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এজন্য ভীম-বিক্রমে তাঁহার সৈন্যেরা দুর্গের সমীপস্থ হইয়া দুর্গের দরজার উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল।

নথে-খাঁর সৈন্যেরা দুর্গের নিকটে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গোলন্দাজশ্রেষ্ঠ গোলামগোস গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। দুর্গের ভবানীশঙ্কর, মহাকালী প্রভৃতি নামধেয় তোপ হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে চারিদিক নিনাদিত করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। নথে-খাঁর সৈন্যগণ দুর্গ হইতে অবিরত অগ্নিবর্ষণের ফলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাণীর সৈন্যদল তাহাদের পলায়নরপর হইতে দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মত ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই নথে-খাঁর সৈন্যর দল ঝাঁসীর রাণীর আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ঝাঁসীর রাণীর কণ্ঠে বিজয়মাল্যখানি সযত্নে পরাইয়া দিলেন বিজয়লক্ষ্মী। নথে-খাঁ পরাজিত হইয়া ভগ্নমনে প্রস্থান করিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বীর্য্যবত্তা, সাহস ও রণনৈপুণ্যের

খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করিল। ঝাঁসী ও বোরছা উভয় রাজ্যমধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ঝাঁসীর রাণীর বীরত্বকাহিনী সর্ব্বত্র প্রাচারিত হইল।

—দশ—

ধন্য রাণী লক্ষ্মীবাই!

ইংরাজদের অনুপস্থিতিকালে রাণী লক্ষ্মীবাই প্রায় দশমাস কাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে ঝাঁসী-রাজ্যের শাসনকার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন।

এ সময়ে রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে তিনি যেরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই নারীজাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। ভারতের যে সমুদয় মহীয়সী মহিলা রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত লক্ষ্মীবাইয়ের তুলনা করা অশোভন নহে।

বিচার-কার্য্যে, শাসন-সংরক্ষণে, সৈন্য-পরিচালনে, রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিবিধানে রাণীর অসাধারণ কর্ম্মপটুতা ছিল। লক্ষ্মীবাই তখন মাত্র তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী। তিনি দেখিতে ছিলেন অপূর্ব্ব রূপসী। তাঁহার সুগঠিত সুন্দর দেহ একদিকে যেমন সৌন্দর্য্যের প্রতিমারূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আবার তেমনি ছিল তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি

অশেষ গুণ। একদিকে যেমন ছিল তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা, অন্যদিকে ছিল তেমনি তাঁহার চরিত্রের কোমলতা। রাজ্য-শাসন ব্যাপারে তিনি কোন সময়েই দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন না। প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। নৈতিক চরিত্রে বলবতী, কঠোরব্রতাবলম্বিনী অনশনপরায়ণা এই বীরাঙ্গনা ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্না মহীয়সী মহিলা।

যে দশ মাস কাল রাণী লক্ষ্মীবাই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি প্রত্যেকটি কাজ নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করিতেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্মকার্য্য, অধ্যয়ন, পারিবারিক কার্য্য ইত্যাদি সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা এখানে বিশদ ভাবে উল্লেখ করিলাম।—দেবপূজা ইত্যাদি সমাপনের পর মধ্যাহ্নভোজন-শেষে কোন গুরুতর রাজকার্য্য না থাকিলে তিনি প্রায় একঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিতেন। পরে তাঁহার নিকট প্রজা ও তালুকদার প্রভৃতির প্রদত্ত বিবিধ উপহার রৌপ্যপাত্রে সজ্জিত ও রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত করা হইত, রাণী যে সকল দ্রব্য গ্রহণযোগ্য মনে করিতেন তাহা রাখিয়া বাকী সব কোঠিয়াল বা নজর বিভাগের মন্ত্রীর নিকট সমর্পণ করিতেন। রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় প্রায়ই পুরুষবেশে, কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া দরবারে উপস্থিত হইতেন—পরনে পায়জামা,

অঙ্গে গাঢ় বেগুনী রঙের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, উহার উপরে পাঠানী পাগড়ী, কোমরে জরির দোপাটা. উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি। এইরূপ পুরুষবেশে তাঁহার যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতিবিয়োগের পর তিনি হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা এবং অনামিকায় হীরার অঙ্গুরী ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। নথের মত কোন অলঙ্কার তিনি পরিতেন না। তাঁহার কেশ গ্রন্থিবদ্ধ থাকিত, শাদা শাড়ি ও শাদা কাঁচুলি তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এইরূপ নারীবেশে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার-ঘরে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর ছিল দরবার ঘরের সংলগ্ন। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত; সুতরাং বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সমীপস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখন কখন আদেশপত্র তিনি লিখিয়া দিতেন। তাঁহার যেমন রাজ্যশাসনক্ষমতা, সেইরূপ দেবভক্তি, আশ্রিতজন-প্রতিপালনের প্রবৃত্তি ও দীন-দুঃখীদের প্রতি দয়া ছিল। নথে-খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার অসীম দয়ার্দ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন।

এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহার, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজাদের মায়ের মত ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা দেশীয় গুণিগণের সমাগম হইত। ঝাঁসী রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কুলদেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম পুত্র দামোদর-রাওকে সঙ্গে লইয়া সরোবর-মধ্যস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ষ্মীর দর্শনে যাইতেন। ফৌজদার ও দেওয়ানী উভয় প্রকার বিচারকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

রাণী লক্ষ্মীবাই কিরূপ দয়াবতী মহিলা ছিলেন এখানে তাহার একটি গল্প বলিতেছি। একদিন রাণী মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে পূজা সমাপন করিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিতেছেন, এইরূপ সময়ে দেখিতে পাইলেন, প্রাসাদে প্রবেশের দক্ষিণ তোরণে সহস্র সহস্র ভিক্ষুক নানারূপ গোলমাল করিতেছে, চীৎকার করিতেছে এবং তোরণদ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে সেই জনতা। মন্ত্রী লক্ষ্মণ পাণ্ডেকে রাণী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি বলিলেন—এই ভিক্ষুকেরা অত্যন্ত গরীব, তাহারা রাণীর নিকট এই আবেদন জানাইতেছে যে, শীতের দরুন তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, তাহাদের গায়ে দিবার কোন বস্ত্র নাই, পরিবার কাপড় নাই, রাণী যদি তাহাদের প্রতি কৃপা না করেন, তাহা হইলে তাহারা বাঁচিতেই পারিবে না।

দয়াবতী রাণী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন

এবং তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী লক্ষ্মণ পাণ্ডেকে বলিলেন ঃ আপনি নগরে ও পল্লীতে প্রচার করে দিন যে, আজ থেকে চার দিন পরে আমি আমার এই গরীব প্রজাদের অভাব দূর করবো।

মন্ত্রী রাণীর আদেশ পালন করিলেন। এদিকে রাণী রাজধানীর সমুদয় দর্জ্জির উপর আদেশ দিলেন—হাজার হাজার গরম জামা ও টুপি তৈয়ার করিতে, বস্ত্রবিক্রেতার প্রতি আদেশ দিলেন—সাদা-কালো যে রঙেরই হউক না কেন, শত শত কম্বল সংগ্রহ করিবার জন্য। রাণীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ দিবসে দরিদ্র প্রজারা রাণীর প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে তাহাদের সকলকে গরম জামা, টুপি ও কম্বল বিতরণ করা হইল। রাণী নিজে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। প্রজারা আনন্দের সঙ্গে রাণীর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—ধন্য রাণী লক্ষ্মীবাই!

মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের এইরূপ দানশীলতা ও প্রজারঞ্জনের দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

ইংরাজপক্ষ হইতে প্রকৃত কি সংবাদ আসিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, রাণী যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া তাঁহার মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীসহ ইংরাজ-শিবিরে গমন করিতেন, তবে ইংরাজরা তাঁহাকে ক্ষমা করিত। অপর মত এই যে, রাণী শিবিরে গমন করিলে ইংরাজরা তাঁহাকে বন্দী

করিবে এইরূপ স্থির করিয়াছিল এবং ইংরাজদের এই সিদ্ধান্তের বিষয় লোকমুখে রাণীর নিকট প্রচারিত হওয়ায় রাণী যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচারিত হয়, রাণী যে ব্যক্তিকে ইংরাজের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজরা তাহাকে ফাঁসী দিয়াছিল। যেরূপ প্রবাদই সত্য হউক না কেন, এইসব নানা কারণে লক্ষ্মীবাই ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ যে রাণীর প্রতি এবং তাঁহার উক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই, তা সত্য বলিয়া মনে করা যায়। এইজন্য রাণী ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন: মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি।

মহারাণী ও তাঁহার সেনানায়কগণ পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইলেন। সে সময়ে ঝাঁসী সহরে ও দুর্গের মধ্যে এগারো হাজার সিপাহী ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদলভুক্ত ছিল। এই সেনার মধ্যে বুঁদেল, আফগান ইত্যাদি রণনিপুণ সৈন্যই ছিল বেশীর ভাগ। এদিকে স্যর-হিউ-রোজও ঝাঁসী আক্রমণ করিবার জন্য স্বয়ং পদাতি-সৈন্যসহ ২৫শে মার্চ্চ তারিখে ঝাঁসীতে উপনীত হইলেন।

—এগারো—

ব্রিটিশ সিংহ—ভারতের সিংহী

স্যর-হিউ-রোজ নগর ও দুর্গের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে ছাউনি করিলেন। ঐ স্থানের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের সারি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাহাড়ের মধ্য দিয়াই ঝাঁসীর পথ চলিয়া গিয়াছিল—অন্যদিক দিয়া দাতিয়ার পথ ছিল প্রসারিত। নগরের কাছাকাছি কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুলগাছের শ্রেণী। উত্তর দিকে উন্নত শিলাসঙ্কুল পর্ব্বতের উপর ঝাঁসীর দুর্গ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান।

২১শে মার্চ্চ স্যর-হিউ-রোজ ঝাঁসীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত রহিলেন। কিভাবে নগর ও দুর্গ আক্রমণ করিবেন তিনি সে বিষয়ে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং যথাস্থানে সৈন্যস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দূরবীণ এবং হেলিয়োগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্র ছিল। এইসকল যন্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ-সেনানীরা দুর্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সহজেই জানিতে পারিত। ২২শে মার্চ্চ নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। রাণী যুদ্ধের পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য রণচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ঝাঁসীর নিকটবর্ত্তী স্থানের তৃণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

২৩শে মার্চ্চ—রাণীর ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। ইংরাজের তোপ দুর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ঝাঁসীর গোলন্দাজরা যখন দুর্গ হইতে মহাকালী, ভবানীশঙ্কর আর ঘনগর্জ্জ নামক তোপ হইতে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ইংরাজ-সৈন্য প্রমাদ গণিল। ইংরাজরা 'ঘনগর্জ্জ' তোপের নাম দিয়াছিল 'হুইস্‌লিং ডিক্' (Whistling dick)। এই তোপের গোলা বড় ভয়ঙ্কর ছিল। এই তোপ হইতে গোলা-বর্ষণের সময় ধূম দেখা যাইত না। এইজন্য কেহ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিত না, এবং হঠাৎ গোলার আঘাতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কাজেই আক্রমণকারীদের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল। ইংরাজ-সৈন্য ইহাতে নিরস্ত রহিল না। তাহারা রাত্রিকালে সুযোগ বুঝিয়া আবার আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। রাণীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার সৈন্যদল রাত্রিকালেও সতর্ক দৃষ্টিতে ও সজাগ ভাবে প্রস্তুত ছিল। রণদামামার ঘন-গভীর রবে, সৈন্যগণের কোলাহলে এবং প্রজ্জ্বলিত মশালের দীপ্তিতে নগর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন প্রভাত হইতেই গোলন্দাজরা দুর্গ-প্রাকার হইতে গোলা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এবারকার তোপের গোলা সেইরূপ ফলপ্রদ হইল না, ইংরাজ-সৈন্যদের মাথার উপর দিয়া পড়িতে লাগিল। ২৪শে মার্চ্চ তারিখের দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনাগণ পশ্চিম দিক হইতে নগর আক্রমণ করিল। নগরের এই অংশ অরক্ষিত ছিল। সহস্র

সহস্র নাগরিক ব্রিটিশের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার জাগিয়া উঠিল। রাজপথ জনশূন্য হইয়া গেল। ইংরাজের তোপের নিক্ষিপ্ত 'শেল্' (কুলুপী গোলক) প্রবল বেগে নগরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ফলে ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিল, নগরের সর্ব্বত্র ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইল। নগরবাসীরা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল,—কোথায় যাইবে? সকল দিক্ অবরুদ্ধ। সর্ব্বত্র অগ্নির লেলিহান জিহ্বা—সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ও হাহাকার। সে এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইল।

এইরূপ বিপদের মধ্যে পড়িয়াও রাণী বিচলিতা হইলেন না। তিনি হতভাগ্য আহত গৃহহারাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন, আহারের জন্য অন্নছত্র খুলিলেন। তাহাদিগকে স্নেহবাক্যে ও সেবার দ্বারা শান্ত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

২৫শে মার্চ্চ, ১৮৫৮। মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের অবস্থা এ সময়ে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা ভাবিলে দুঃখিত হইতে হয়। একদিকে প্রজাদের রক্ষণ ও পালন, অপর দিকে যুদ্ধের আয়োজন ও পরিচালন, তরুণী লক্ষ্মীবাই কোনরূপে ভীতিবিহ্বলা হইয়া হাল ছাড়িলেন না। রাণীর সৈন্যেরা কোনরূপেই বিচলিত না হইয়া—আক্রমণকারীদের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় সাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিতেছিল।

পঁচিশে তারিখ ইংরাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক দুর্গের দক্ষিণ দিক্ আক্রান্ত হইল। এ সময়ে রাণীর গোলন্দাজ গোলাম-গোশখাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এইরূপ ভাবে আক্রমণকারীদিগের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিলেন যে, ইংরাজের তোপ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মীবাই এই বীর পুরুষকে উপযুক্ত অর্থ পারিতোষিক স্বরূপ দান করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ২৫শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত আক্রমণকারীদিগের সহিত ঝাঁসীর রাণী ও তাঁহার সৈন্যগণ যেরূপ ভাবে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি ব্যতীতও ইংরাজ-সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। এমন কি ইংরাজ-সেনাপতিরা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত কণ্ঠে রাণীর বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

ক্রমে ইংরাজ-সৈন্যের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহারা নগরের প্রধান তোরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর মারামারি ও কাটাকাটি চলিতে লাগিল। সে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা কল্পনাও করিতে পারা যায় না।

—বারো—

ঝাঁসী অবরোধ—রাণীর বীরত্ব

একাদশ দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রতিদিন রাত্রিকালে ইংরাজদের তোপ হইতে যখন একমণ দেড়মণ ওজনের গোলা বর্ষিত হইত, তখন চারিদিকে তাহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িত। অন্ধকার রাত্রিতে এই গোলার দৃশ্য ভীষণ দেখাইত। দিনের বেলা প্রখর সূর্য্যালোকে ঐরূপ দেখা যাইত না। কে জয়ী হইবে বলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কখনও বিজয়িনী হইতেন ঝাঁসীর রাণী,—তাঁহার দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত তোপের ফলে ইংরাজের তোপ বন্ধ হইয়া যাইত। আবার কখন হইত ইংরাজের জয়, রাণীর পরাজয়। ইংরাজের ঘন ঘন নিক্ষিপ্ত তোপের গোলাগুলিতে নগরবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত।

রাণীর তোপমঞ্চ ইংরাজের গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া গেলে পর, রাণী রাত্রিকালেই রাজমজুর নিযুক্ত করিয়া পুনরায় মঞ্চের সংস্কার করিতেন ও নূতন মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেন। রাজমিস্ত্রিরা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কালো কম্বল জড়াইয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাহারা নির্ভীক ভাবে এই ভীষণ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

যুদ্ধের অষ্টম দিবসে ইংরাজ গোলন্দাজরা দূরবীক্ষণের

সাহায্যে দুর্গের মধ্যস্থিত জলরক্ষার বৃহদাকার চৌবাচ্চাগুলি লক্ষ্য করিয়া তোপ ছাড়ায় কয়েক জন জলবাহী ভৃত্যের প্রাণান্ত হইল। অনেকে পলায়ন করিল। তখন দুর্গের গোলন্দাজরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরাজ গোলন্দাজদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভাবে তোপ দাগিতে লাগিল, তাহারই ফলে ইংরাজ গোলন্দাজদের তোপ বন্ধ হইল। জলের চৌবাচ্চাগুলি আবার জলে পূর্ণ হইল। সকলে স্নান শেষ করিয়া আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শোনা গেল ভীম ভৈরব কামানের গর্জ্জন। সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ! শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল, রাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যস্থিত একটি বারুদখানায় ইংরাজের তোপ-নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে ঐরূপ ভয়ানক শব্দ হইয়াছে। এই আকস্মিক শোচনীয় দুর্ঘটনায় ত্রিশটি পুরুষ, আটজন মহিলা এবং প্রায় পঞ্চাশ জন নারী অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিল।

এই অষ্টম দিনে ইংরাজ-সৈন্য অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়। দুর্গ-প্রাকারের যে সমুদয় গোলন্দাজ ও সিপাহী ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে সেদিন প্রাণ হারায়। লক্ষ্মীবাই সেদিন অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রাণীর অপূর্ব্ব তেজস্বিতা এবং

উৎসাহের ফলে ঝাঁসীর সৈনিকগণ নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অমানুষিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনও প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করে নাই। গোলাগুলি নিঃশেষ-প্রায়, তবুও ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ-সৈন্যেরা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মেলিস্‌ন সাহেব এ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—“পরবর্ত্তী দুই দিন অনবরত ইংরাজপক্ষ হইতে মহোৎসাহ সহকারে গোলাগুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা ইহাতে বিচলিত না হইয়া সমান ভাবে তোপ দাগিতে লাগিল। বিপদের ভিতরেও তাহারা বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।”

—তেরো—

তাত্যা-টোপের পরাজয়—লক্ষ্মীবাইয়ের অপূর্ব্ব বীরত্ব

৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় স্যর-হিউ-রোজ সংবাদ পাইলেন, উত্তর দিক হইতে একদল সৈন্য ঝাঁসী দুর্গের অবরুদ্ধ অধিবাসীদিগের উদ্ধারের জন্য আসিতেছে।

এই সৈন্য হইতেছে তাত্যা টোপের। তাত্যা-টোপে ইংরাজ সেনানায়ক উইণ্ডহাম্‌কে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গঙ্গানদী পার হইয়া অবশেষে নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র

তাত্যা টোপে
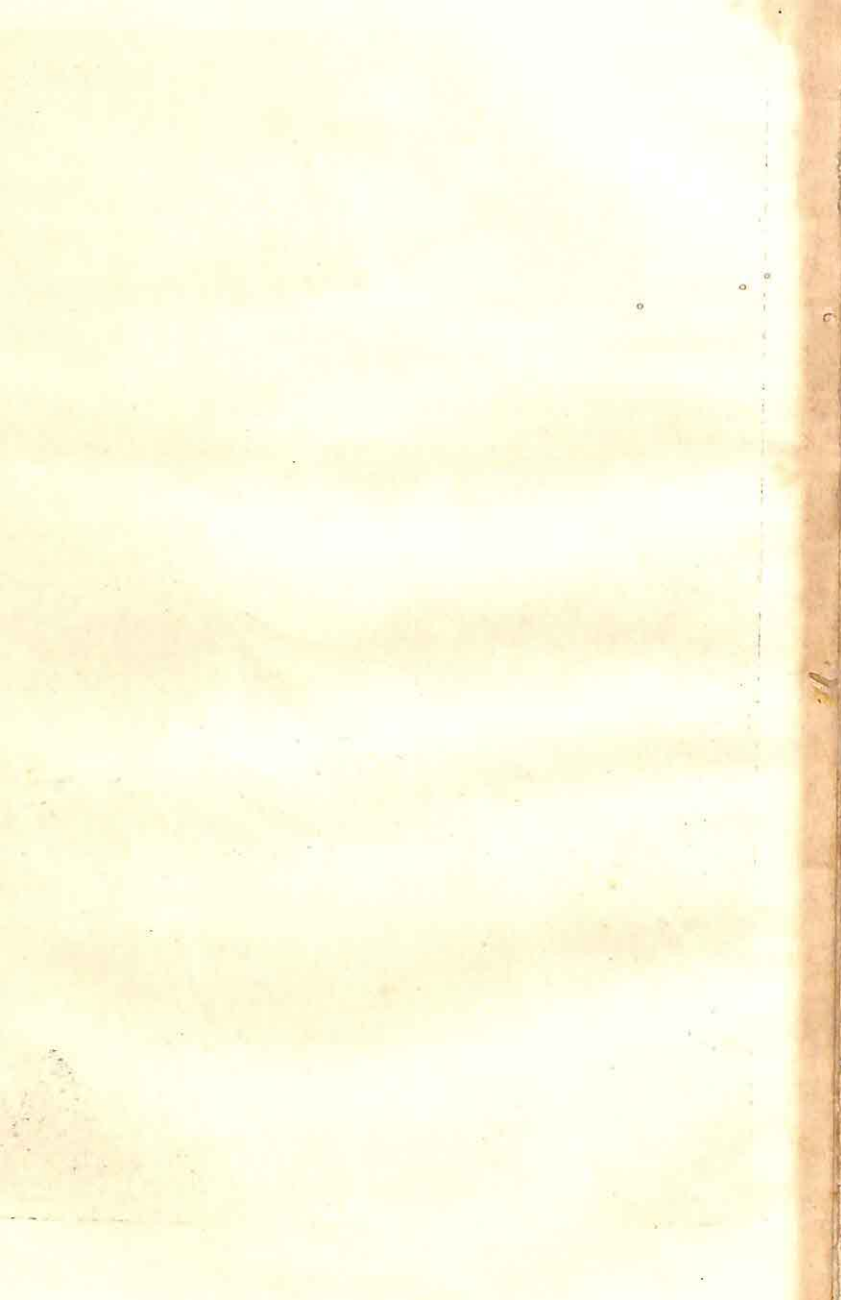
রাওসাহেবের আদেশে কাল্পিতে আসেন। রাওসাহেবের আদেশ চিরকারি (Chirka'ri) অধিকার করেন। সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র চারিটি কামান এবং নয়শত সিপাহী। কিন্তু তিনি চিরকারি জয় করিয়া চব্বিশটি কামান ও তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এ সময়ে রাওসাহেব ঝাঁসীর রাণীর নিকট হইতে সাহায্য-প্রার্থনার পত্র পাইলেন। তাত্যা-টোপে রাওসাহেবের নিকট হইতে ঝাঁসীর রাণীকে সাহায্য করিবার আদেশ পাইয়া কুড়ি হাজার সৈন্য ও ২৮টি কামান লইয়া ঝাঁসী অবরোধকারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

এখানে তাত্যা-টোপের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। বিদ্রোহসময়কার বিলাতী 'ডেলিনিউস' পত্রে, তাঁহার এইরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হয় :

"তাত্যা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ—উচ্চবংশের নহে। তাহাতে দস্যুবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁহার চাতুর্য্য বুদ্ধি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তিনি লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু সিপাহীগিরি কাজে খুব মজবুৎ। ইহার জন্য তাঁহার উপর, তাঁহার অনুচরবর্গের অচল নিষ্ঠা। তাঁহার দেহের গঠন সুদৃঢ় হৃষ্ট-পুষ্ট ও সতেজ। নৈতিক প্রভাব অপেক্ষা বাহুবলের প্রতাপে তিনি অন্যের মনে উৎসাহ ও বল সঞ্চার করেন। ইংরাজের যে সমর-বিদ্যায় কুশল, ইহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই জন্য, সমরক্ষেত্রে ইংরাজ-দিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া, তাহাদিগকে অনুধাবন

করিয়া ক্লান্ত করিতে তাঁহার ভাল লাগে। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর। তিনি অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত বেগশালী, তেজীয়ান ও সাহসী। তাঁহার শৌর্য্যযুক্ত সতেজস্থন্দর মুখশ্রী। তাঁহার দৃষ্টি চপল ও উগ্র। ভ্রূযুগল ধনুকাকার, কপাল উচ্চ ও সরল, নাসিকা গরুড়পক্ষীর ন্যায়, মুখ ছোট, ঠোঁট চাপা ; দাঁত ধপ্ধপে সাদা, গোঁফ কালো ও দেহবর্ণ ঘনশ্যামল। কেতা-দুরস্ত অপেক্ষা দেহ রক্ষণোপযোগী কাপড় পরিতে তিনি ভাল-বাসেন। তিনি সর্ব্বদা পা পর্য্যন্ত লম্বা একটা জোব্বা পরেন ও কাঁধের উপর একটি কাশ্মীরি শাল ফেলিয়া রাখেন ; তাঁহার সহিত বারোমাস, প্রায় ২৫।৩০ জন লোক প্রহরী থাকে। ইহাদের সাহায্যে, যুদ্ধের মধ্যে তিনি আপনাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করেন। "নানা সাহেবের প্রতিনিধি" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্ত বাজীরাও সাহেব পেশোয়াকে যে পেন্শন দেওয়া হইত, সেই পেনশনের টাকা তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজরা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রসিদ্ধ নানা সাহেব সিপাহী-বিদ্রোহে যোগ দেন।

তাত্যা-টোপে, কাল্পী হইতে বিপুল সৈন্যসহ ঝাঁসীর সাহায্যে আসিতেছেন দেখিয়া, কেল্লার লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এ সংবাদে স্যর-হিউ-রোজ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে এখনও ঝাঁসীর দুর্গ অপরাজেয় ও অনধিকৃতরূপে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্যর-হিউ-রোজ আসন্ন বিপদের

জন্য চিন্তিত হইলেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। ইংরাজ-চরিত্রের ইহাই হইতেছে প্রধান বিশেষত্ব। বুদ্ধিমান, সাহসী ও কৌশলী হিউ-রোজ দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য সৈন্য ব্যবস্থা করিয়া তাত্যা-টোপের ঝাঁসীর দিকে আক্রমণ-গতি প্রতিহত করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

তাত্যা-টোপে বেটোয়া বা বেত্রবতী নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ইংরাজের সৈন্য-সংখ্যা যখন অল্প, তখন আর ভাবনা কি ?

কিন্তু রণদক্ষ কৌশলী হিউ-রোজ দুর্গ অবরোধের জন্য অল্প-সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া তাত্যাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আকস্মিক আক্রমণে তাত্যার অগ্রগামী সৈন্যদল পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাত্যা এইরূপ পরাজয়ের আশঙ্কা করেন নাই। তাঁহার ছাউনির নিকটে ছিল নিবিড় জঙ্গল, তাত্যা সেই জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিলেন। সারা আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এইরূপে ইংরাজদের আগমনপথ অগ্নিসঙ্কুল করিয়া বেত্রবতী নদী পার হইয়া তাত্যা সসৈন্যে কাল্পির দিকে প্রস্থান করিলেন। ইংরাজ-সৈন্য সমুদয় বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া তাত্যাকে পশ্চাৎদিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে প্রায় পনের শত বিদ্রোহী সৈন্য নিহত হইল এবং তাত্যা-টোপের প্রায় সমুদয় কামানগুলিই পড়িল ইংরাজের হাতে।

রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁহার ভীষণ সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে যখন

জয়-পরাজয় লইয়া চলিয়াছিল অদৃষ্টের পরীক্ষা, যখন দুর্গ অবরুদ্ধ, জীবন-মরণ সমস্যা, সেই সময়ে তাত্যা বহু সৈন্য ও তোপ লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিতেছেন শুনিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন এবং দুর্গবাসী সৈন্যগণ মহা উৎসাহে প্রফুল্লচিত্তে সারারাত্রি মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই নিজে সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। যখন সংবাদ পাইলেন যে, তাত্যা-টোপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখনও নিরাশ হইলেন না। তখনও তাঁহার উৎসাহ কমিল না, তিনি নবীন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মহারাণী লক্ষ্মীবাই রাজোচিত জাঁকজমকের অত্যন্ত পক্ষ-পাতিনী ছিলেন। কোনও বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে বাইসাহেবা যখন মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেন, তখন সহস্র সহস্র নরনারী সেই শোভাযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। রাণী যখন শিবিকাতে চড়িয়া দেবীর মন্দিরে যাইতেন, তখন শিবিকার উপরে থাকিত স্বর্ণখচিত রেশমী আবরণ, সেই আবরণ স্বর্ণরজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকিত, আবার যখন তিনি অশ্বারোহণে গমন করিতেন, তখন তিনি পুরুষের বেশে যাইতেন, সে সময় তাঁহার অপরূপ সাজসজ্জায় তাঁহাকে দেখাইত অপূর্ব্ব সুন্দর, যেন একজন রণবীর রণযাত্রা করিতেছেন; পৃষ্ঠে দুলিত কালনাগিনীর ন্যায় বিলম্বিত স্বর্ণখচিত দীর্ঘ কেশজাল, স্বর্ণখচিত মুকুট এবং অপরূপ ভূষণ। রণসঙ্গীত গাহিয়া

চলিত গায়কদল। তাঁহার সম্মুখে চলিত স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকা, দুইশত ইউরোপীয় জাতীয় পতাকার পশ্চাদনুসণ করিত এবং একশত অশ্বারোহী সৈনিকদল পতাকার পুরোভাগে অগ্রসর হইত।

শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে কারবারী, মন্ত্রী, তালুকদার এবং ভায়া-সাহেব উপাসনীর ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ কেহ পদব্রজে, কেহ বা অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। রাণী যখন রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইতেন, তখন প্রাসাদে মধুর গীতধ্বনি হইত, নহবত বাজিত এবং নগরের সর্ব্বত্র আনন্দের প্রবাহ বহিয়া যাইত। সে সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে যমুনার তীর পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজের কোন প্রভাব ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, মৌলবি, সর্দ্দার, দোরকদার, সিপাহী, রক্ষী, রাজা, রাও, বণিক, কুসীদজীবী গ্রামবাসী সাধারণ পুরুষ ও নারী পর্য্যন্ত স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যেকের মনে ও প্রাণে স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়াছিল। এই সব অগণিত নরনারীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জোরাল কণ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাই বলিয়াছিলেন—'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গী নেহি!' এই বাণী কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। সকলে পণ করিল—লড়িয়া মরিব, তবু শত্রুর হাতে ঝাঁসী দিব না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাণী যে সংবাদ ইন্দোরে মধ্যভারতের এজেণ্ট স্যর রবার্ট হেমিণ্টনের নিকট দূতদ্বারা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শত্রুর হস্তগত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিল। বিশ্বাসঘাতকদের

ষড়যন্ত্রের ফলে, কোথায় রাণী দশমাসকাল ঝাঁসীর শাসন-সংরক্ষণ করিবার জন্য ইংরাজের কাছে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত হইবেন—তাহা না হইয়া হইল তাহার বিপরীত।

ইংরাজ সেনাপতি স্যর-হিউ-রোজ (Sir Hugh Rose) বিদ্রোহ দমন করিতে ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি ঝাঁসী হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে চন্দনপুরে ছাউনি ফেলিলেন। লক্ষ্মীবাই ভাবিলেন, আমি দশমাসকাল ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া ঝাঁসীর সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়াছি, বিদ্রোহ-দমন হইলেই ইংরাজ সরকার আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সমাদর করিবেন। এইরূপ আশা পোষণ করিয়া তিনি সমুদয় বিবরণ স্যর-হিউ-রোজকে জানাইলেন। কিন্তু যে উত্তর আসিল তাহাতে রাণী আপনাকে যারপরনাই অপমানিত মনে করিলেন। স্যর-হিউ-রোজ বলিয়া পাঠাইলেন : মহারাণী লক্ষ্মীবাই যদি দুর্গ খালি করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় লক্ষ্মণরাও দেওয়ানজী লালা-ভাউ বক্শি প্রভৃতি আট ব্যক্তিকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে রাণী যে ইংরাজের পক্ষে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি।

রাণী এইরূপ উত্তরে প্রাণে আঘাত পাইলেন। বীরাঙ্গনা এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভবিষ্যতে ইংরাজের সহিত মিত্রভাব ও সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া মিলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, এইবার সেই আশায়

জলাঞ্জলি দিয়া সম্মুখে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা করিয়া আত্মসম্মান ও রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাই স্থির করিলেন।

—চৌদ্দ—

বিশ্বাসঘাতক বুন্দেলা সর্দ্দার লালাজী ঠাকুর

১লা এপ্রিল হইতে আবার ঝাঁসীর দুর্গবাসীরা উৎসাহের সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১লা এপ্রিল তাঁহারা যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, ২রা ও ৩রা এপ্রিল হইতে দুর্গবাসীদের সেই উদ্যম হ্রাস পাইতে লাগিল।

কৌশলী সৈন্যাধ্যক্ষ স্যর-হিউ-রোজ সাহেব রাণীর দিকের শক্তি যে হ্রাস পাইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মেজর গলের (Major Gall) অধিনায়কত্বে ১৪নং লাইট ড্রগুন্‌স (Light Dragoons) নামক সৈন্যদল সম্মুখের দিকে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার ব্যবস্থার এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, যেমন গলের সৈন্যগণের কামান-ধ্বনি শোনা যাইবে, সেই সময়ে অপর দল নগরের দিকে অগ্রসর হইবে। ৩রা এপ্রিল রাত্রিশেষ তিনটার সময় ইংরাজ-সৈন্যের নগর প্রবেশের সুযোগ ঘটিল। জনশ্রুতি এই, রাণীর পক্ষের লালাজী ঠাকুর নামক একজন

বুন্দেলা সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ইংরাজ-সৈন্য 'বোরহা দরওয়াজা' অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গলের পরিচালিত সৈন্যদের নিকট পূর্ব্ব সঙ্কেতমত তোপধ্বনি শুনিয়া—মেজর ষ্টুয়ার্ট (Major Stuart), কাপ্তেন লিউথ (Captain Lewth) প্রভৃতি নীরবে নগর-প্রাচীরের তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাণীর পক্ষ হইতে শত্রুর দিকে ভীষণভাবে গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। একজন ইংরাজ লেখক এ-বিষয়ে লিখিয়াছেন :—

যুদ্ধের সময় মনে হইত যেন, যম এবং সর্পবেণীধারিণী, উগ্র-প্রকৃতি পরিচারিকাগণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের অন্তর্ভাগে অবিরত ভেরী, হৈ চৈ প্রভৃতির গভীর শব্দ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাড়াতাড়ি আমাদের ধ্বংস করিতে আসিতেছে।

সে সময়ে রাণীর পক্ষ হইতে এমন ভাবে গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে—তাহাতে মনে হইতেছিল যেন কেহ একটা আগুনের চাদর বিছাইয়া দিয়াছে, যদি আর কিছুকাল ঐরূপভাবে রাণীর দিক হইতে গোলাগুলি চলিতে থাকিত, তাহা হইলে আমাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য্য।

এইরূপ গোলাবর্ষণে কিয়ৎকালের জন্য ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যেরা নগর-প্রবেশের পথে বাধা পাইলেও অবশেষে মইয়ের সাহায্যে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর উঠিতে পারিয়াছিল। ইংরাজ-সৈন্য ঝাঁসী নগরে প্রবেশ করিলে পর তাহারা নগরের পথে অগ্রসর হইয়া পথের

দুইদিকের ঘরগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আগুন জ্বলিল, ও-দিকে আবার নগরবাসীরা আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইতে লাগিল। নগরবাসীরা যে যে-দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন নগরবাসী গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া নারীর বেশে আত্মরক্ষা করিল, অর্থাৎ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, যে যেরূপে যেভাবে পারিল প্রাণরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তেরোদিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝাঁসীর সৈন্য পরাজয় মানিয়া লয়।

কিন্তু এ পরাজয় স্বীকারে তাহাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রাণী লক্ষ্মীবাই যদি অন্য বিদ্রোহী দলের সাহায্যলাভ করিতেন, বিদ্রোহীগণ যদি একটি নির্দ্দিষ্ট রণপরিকল্পনা নিয়া যুদ্ধ করিতেন, তবে এই বীরাঙ্গনা নারীর বীরত্ব প্রভাবে ইংরাজকে চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু সে সুযোগ সে সময় পাইবার সম্ভাবনা হইল না।

—পনেরো—

ইংরাজের ঝাঁসী প্রবেশ—রাণীর দুর্গ ত্যাগ

স্যর-হিউ-রোজ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নগরের মধ্যস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহার সৈন্যেরা প্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্য প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়,

তখন প্রাসাদ-রক্ষী প্রহরীরা তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক কক্ষের সৈনিকেরা আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু বেয়োনেট বা সঙ্গীনের সাহায্যে ইংরাজ-সৈন্য. প্রহরী-সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এইভাবে রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইল। দুই ঘণ্টার পরে দেখা গেল—রাণীর দেহরক্ষী পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সেনা রাজপ্রাসাদের অশ্বশালার নিকট থাকিয়া সেদিক্ রক্ষা করিতেছে। তাহারা যারপরনাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল। কিন্তু গোরা-সৈন্য অধিক সংখ্যক থাকায় এবং রাজবাটীর চারিদিকে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় প্রহরীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অবশেষে গোরা-সৈন্য হল্লা করিয়া রাজবাটী প্রবেশ করিল। প্রহরীদের এই বীরত্ব ও প্রভুভক্তি এবং রাণীর জন্য আত্মোৎসর্গ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই বিজয়লাভের পর বিজয়ী ইংরাজ, রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা হস্তগত করিলেন। এই পতাকার একটু ইতিহাস আছে। রাণীর স্বামী গঙ্গাধর-রাওয়ের পিতামহকে তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক এই রেশমী ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা উপহার দান করিয়াছিলেন এবং এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে, কোন স্থানে যাতায়াতকালে তিনি সেই পতাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন।

ইংরাজ-সৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে রাণী দুর্গ হইতে শুনিতে পাইলেন, আক্রমণকারিগণের নগর লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতির দরুন হতভাগ্য প্রজার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি। এই সময়ে শত্রুপক্ষীয়কে বাধা দিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। নগর ভস্মীভূত, গোলন্দাজ সৈনিকেরা অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শুনিলেন, কেল্লার দ্বার রক্ষাকারী সর্দার কুম্বর খোদাবক্স এবং তোপখানার প্রধান গোলন্দাজ—গোলাম গোশ-খাঁ উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কেমন করিয়া আর দুর্গ রক্ষা পাইবে? কাজেই তিনি তাঁহার প্রিয়তম ঝাঁসী নগরী পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। পিতা মোরোপন্ত ও বিশ্বস্ত অনুচরগণ, সঙ্গিনী ও পরিচারিকাগণ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে পুরুষের বেশ পরিলেন—প্রিয়তম পুত্র দামোদর-রাওকে নিজের পিঠে রেশমী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলেন এবং তৃতীয় হাওদার মধ্যে মণি-মাণিক্য প্রভৃতি পুরিয়া দিলেন। তারপর ৪ঠা এপ্রিল রাত্রিতে সকলের অলক্ষিতে কৃপাণ-হস্তে নিজের বীর সৈনিক ও ধানুকীদের সহিত দুর্গের উত্তর দ্বার ভাণ্ডারী নামক তোরণ দিয়া বাহির হইলেন। শেষবারের মত একবার আপনার প্রিয় দুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বেগবান্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাল্পির দিকে চলিলেন। পর-দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীবাই নির্বিঘ্নে কাল্পি পৌঁছিলেন। তাত্যা-টোপে সে-সময়ে কাল্পিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

স্যর-হিউ-রোজ ৫ই এপ্রিল (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) ঝাঁসী দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দুর্গ অধিকার করিতে তাঁহার পক্ষের ৩৪৩ জন সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৩৬ জন ছিলেন অধ্যক্ষশ্রেণীর। ঝাঁসীর পক্ষে পাঁচ হাজার সৈন্য হত হইয়াছিল আর অগ্নিদাহে ও ইংরাজ-সৈন্যের হাতে প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়।

—ষোল—

রাণীর হাতে ব্রিটিশ বীরের লাঞ্ছনা

বিজয়ী স্যর-হিউ-রোজ দুর্গে প্রবেশ করিবার পরেই যখন জানিতে পারিলেন, রাণী দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবার জন্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট ওয়াকারকে পাঠাইলেন তাঁহার অনুসরণের নিমিত্ত। কর্ণেল ওয়াকার অতি বেগে রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে ঝাঁসী হইতে বাইশ মাইল দূরে তাঁহার নাগাল পাইলেন। উভয়ে মুখোমুখি হইলে রাণী বিদ্যুদ্বেগে ওয়াকারকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন, আহত ওয়াকার ভূপতিত হইল। রাণী সেই সুযোগে—অতি বেগে অশ্বচালনা করিয়া কাল্পিতে গিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। কর্ণেল ওয়াকার ব্যর্থমনোরথ হইয়া ঝাঁসী ফিরিয়া গেলেন। রাণীর পিতা মোরোপন্ত যে হস্তীর পৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, সেই হস্তীর পৃষ্ঠেই দৈবক্রমে তাঁহার নিজ তরবারির আঘাতে তাঁহার জঙ্ঘাদেশ কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি রুধিরপ্লাবিত পরিচ্ছদে কোনরূপে ধনরত্ন ইত্যাদি সহ দাতিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। দাতিয়ার রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। স্যর রবার্ট হ্যামিল্টনের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

রাণী ঝাঁসী পরিত্যাগ করিবার পর বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্যরা প্রায় পাঁচ হাজার নিরীহ নগরবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারের সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় নিজের হাতে পুরমহিলাদিগের প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। গোরা-সৈন্যেরা চারিদিকের দরজা দিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইতে ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত পুরুষ দেখিবা মাত্র তাহারা গুলি কিংবা তরবারির দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। সহরের এক দিকে আগুন জ্বালাইয়া দিল। সেই সময় সহরের মধ্যে যে হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। মেষপালের মধ্যে বাঘ আসিয়া পড়িলে যেরূপ দশা হয়, লোকেরা প্রাণভয়ে আকুল হইয়া সেইরূপ পলাইতে লাগিল। কেহ বা গলির মধ্যে প্রবেশ করে, কেহ বা গৃহের গোপন স্থানে গিয়া লুকায়, কেহ বা দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া স্ত্রীবেশ পরিধান করে, এইরূপে যে যেরূপ পারিল প্রাণ বাঁচাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। গোরারা সহরে প্রবেশ করিয়া

সহর একেবারে বিজন করিয়া তুলিল; সহরের মধ্যভাগে "ভিড়্যার বাগ" নামক একটি উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে সহস্র সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানেও যখন গোরারা প্রবেশ করিল, তখন সেই সকল অসহায় লোক অতি দীনভাবে ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া করুণ-স্বরে বলিতে লাগিলঃ আমি নিরপরাধী কৃষক; আমি যুদ্ধের মধ্যে নাই—দয়া করিয়া আমার প্রাণ দান করুন। তাহাদিগের এইরূপ বাক্যে ইংরাজ-সেনা-নায়কের দয়া হইল। তিনি সেই প্রণত লোকদিগকে অভয় বচন দিয়া উদ্যানের চারিদিকে পাহারা বসাইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া দিলেন; এইরূপ হুকুম প্রচার করিলেন যে, বাহিরের লোককে ভিতরে আসিতে এবং ভিতরের লোককে বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয়।

কিন্তু অন্য দিকে গোরারা লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সোনা-রূপার সামগ্রী লুঠ করিতে লাগিল, যতক্ষণ না নাগরিকদের অর্থ-সম্পত্তি তাহাদের হস্তগত হইল, ততক্ষণ তাহাদের ছাড়িল না, এমন কি অর্থ পাইলেও, শেষে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। কোথাও এইরূপ হইয়াছে যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া গোরারা পুরুষকে গুলি করিতেছে, সেই সময় তাহার স্ত্রী আসিয়া স্বামীর কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—সেই অবস্থায় গুলি স্বামীর গায়ে না লাগিয়া স্ত্রীর গায়ে লাগিয়া সে নিহত হইয়াছে। কিন্তু একথা বলিতে হইবে স্ত্রীলোকদিগকে উহারা কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক মারে নাই।

এখানে এ-কথা উল্লেখযোগ্য, ইংরাজ-সৈনিকেরা মহিলাদিগের প্রতি কোনরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। কথিত আছে, ইংরাজ-সেনাপতি বিলুণ্ঠিত খাদ্যদ্রব্যাদি হইতে নগরের দুঃখী-দরিদ্রদিগকে আহার্য্য বিতরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

—সতেরো—

'তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা করুন'

রাণী যখন কাল্পিতে পৌঁছিলেন—তখন সেখানে রাওসাহেব ও তাত্যা-টোপের সাক্ষাৎ পাইলেন। রাণী রাওসাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর প্রথমেই তাঁহাকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং রাওসাহেবের সমক্ষে নিজের তরবারিখানা রাখিয়া বলিলেন ঃ আপনি পেশোয়ার উত্তরাধিকারী। এই তরবারি এক সময়ে আপনার পূর্ব্ব-পেশোয়ারা আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদের বীরত্বের জন্য উপহার দিয়েছিলেন। আমি অবলা নারী হয়েও এই তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা করেছি। আমার হাতে এ তরবারি কলঙ্কিত হয় নাই। এখন এ-তরবারি আপনি ফিরিয়ে নিন, নতুবা আমার মান-মর্য্যাদা ও ঝাঁসী রক্ষার জন্য আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।

রাণীর কথায় রাও-সাহেবের হৃদয় বিগলিত হইল, তাঁহার

সৈন্যের দ্বারা রাণীর যে সাহায্য হয় নাই সেজন্য দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ আপনার ন্যায় বীরাঙ্গনার হাতেই এই তরবারি শোভা পায়, এই বলিয়া তরবারিখানি লক্ষ্মীবাইয়ের হাতে সমর্পণ করিলেন।

রাণীর অনুরোধ রক্ষিত হইল। তাত্যা-টোপের উপর সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। স্থির হইল, সমুদয় সৈন্য একস্থানে সমবেত হইলে তাত্যা-টোপে রাওসাহেবের সহিত মিলিত হইবেন। কাল্পীর চল্লিশ মাইল দূরে কুঁচ (Kunch) নামক নগরে তাত্যা সসৈন্যে গমন করিলেন। স্যর-হিউ-রোজ বিদ্রোহী দলের নেতা তাত্যা-টোপে ও রাণী লক্ষ্মীবাইকে আক্রমণ করিবার জন্য কাল্পীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কুঁচ নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে তাত্যা-টোপে পরাজিত হইলেন। রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাত্যা তাঁহার নিকট যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে কোনরূপ পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই যুদ্ধে পরাজয় হইলেও সৈন্যদলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

কুঁচের যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনার সহিত যুদ্ধ হইল যমুনার তীরবর্ত্তী গলাবলী নামক স্থানে। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব দুই হাজার ঘোড়সওয়ার এবং কয়েকটি কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। রাণীর উপর শুধু আড়াই শত অশ্বারোহী সেনা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। রাওসাহেব একজন মহিলার উপর সৈনিকদল পরিচালনার ভার দেওয়া অশোভন

বলিয়া নিজে সৈন্যাধক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণীর উপর যমুনার দিক রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। ইংরাজ-সৈন্য গলাবালির যুদ্ধেও বিজয়ী হইলেন। রাওসাহেব ও বান্দেওয়ালার নবাব প্রভৃতি পলায়নের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রাণী তাহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন ঃ পলায়ন অসম্ভব! যুদ্ধে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। আপনারা পুরুষ, ভীরুর মত পলায়ন করতে চাইছেন, না-না সে হতে পারে না। আসুন আমরা যুদ্ধ করে মৃত্যুকে বরণ করি। রাণী তাঁহাদিগকে এইভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়া একদল সাহসী সৈনিকসহকারে এমন ভাবে অগ্রসর হইয়া ইংরাজ-সৈন্যের দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল। অশ্বে আরোহণ করিয়া এই বীরাঙ্গনা নারী সাহসী সৈনিকদল সহ শত্রুসৈন্যের উপর গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি ইংরাজপক্ষে নূতন একদল সৈন্য আসিয়া পরাজিত সৈন্যের স্থান পূর্ণ না করিত, তবে তাহাদের পক্ষে বিজয় লাভ করা সম্ভব হইত না।

কাল্পীর যুদ্ধে রাণী অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু রাওসাহেব পলায়ন করায় তাঁহাকেও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কাল্পীতে তাত্যা-টোপে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া কামান, বারুদ ও গোলাগুলি প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধের সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সমুদয়ই ইংরাজদের হাতে পড়িল।

—আঠারো—

গোয়ালিয়র দুর্গ-বিজয়

কাল্পী হইতে রাওসাহেব, তাত্যা-টোপে ও লক্ষ্মীবাই গোপালপুরে আসিলেন। এই গোপালপুর গোয়ালিয়র হইতে মাত্র ৪৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

এখানে অতঃপর কি ভাবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীবাই পরামর্শ দিলেন, এইরূপ ভাবে প্রান্তরে-প্রান্তরে ঘুরিয়া যুদ্ধ করিলে শত্রুসৈন্য পরাজয় করা সম্ভবপর নহে। যদি কোন দুর্গ অধিকার করিয়া সেখান হইতে আক্রমণ পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে সুবিধা হয়। গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিয়া সেখান হইতে আক্রমণ পরিচালনা করিলে সবদিকেই সুবিধা হইতে পারে। কেননা, গোয়ালিয়র দুর্গ দুরারোহ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। রাণীর এই পরামর্শ সকলেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন কি ভাবে গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাও-সাহেব নিজের বংশপরিচয় এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গোয়ালিয়রের শ্রীমন্ত মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া এবং তাঁহার মাতামহী বাইজাবাই সিন্ধের নিকট পত্র লিখিয়া, সেইদিনই তাঁহারা (৩০শে মে তারিখে) গোয়ালিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর পরিত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে গোয়ালিয়রে দিনকর-রাও ছিলেন দেওয়ান সাহেব। মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া এবং বাইজাবাই প্রভৃতির ছিল ইংরাজদের সহিত সন্ধি। এই জন্য তাঁহারা বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইতে চাহেন নাই। দিনকর-রাও বিজ্ঞ ও দূরদর্শী কূটরাষ্ট্র-নীতি-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রে যে সমুদয় ইংরাজ পুরুষ ও নারী ছিলেন, তাঁহাদের নিরাপদে আগ্রা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।—তিনি বুঝিয়াছিলেন পেশোয়ার ভ্রাতা রাওসাহেব যদি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন তাহা হইলে দরবারের সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া রাওসাহেবের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি প্রকাশ্যে কোনরূপ বিদ্রোহ-ভাব না দেখাইয়া, বরং প্রকাশ্যে বিদ্রোহী দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপনে রাওসাহেব তাত্যা-টোপে ও রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচালিত সৈন্যদিগকে গোয়ালিয়র রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইংরাজদিগকে আহ্বান করিলেন। এ সময়ে ইংরাজেরা মধ্যভারতের বহুস্থানে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। মন্ত্রী দিনকর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মহারাজা জয়াজীরাও-ও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু পরে মন্ত্রীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়া আপনার আত্মগরিমা ও বীরত্ব ইংরাজকে দেখাইবার জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক ১লা জুন তারিখে ছয় হাজার পদাতিক,

দেড় হাজার অশ্বারোহী এবং নিজের দেহরক্ষী ছয় শত সৈন্য এবং আটটি কামান সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

মুরার নামক স্থানের দুই মাইল পূর্ব্বে জয়াজীরাও শিবির সন্নিবেশ করিয়া বেলা ৭টার সময় রাওসাহেব প্রমুখ বিদ্রোহী সেনাদলের বিরুদ্ধে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। রাওসাহেব এই গোলাবর্ষণ দেখিয়াও ভাবিতে পারেন নাই, জয়াজীরাও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, জয়াজীরাও সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন এবং গোলাবর্ষণ দ্বারা তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইতেছেন। এজন্য রাওসাহেব নিশ্চেষ্ট রহিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাই কিন্তু নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি তাঁহার তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া জয়াজীরাওয়ের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি এমনভাবে গোয়ালিয়রের সৈন্যদের উপর গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, গোয়ালিয়রের গোলন্দাজেরা তাঁহার আক্রমণ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তোপ ফেলিয়া পলায়ন করিল। মহারাজের শরীররক্ষক সৈনিকগণ মহারাজকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তাহারা লক্ষ্মীবাইয়ের আক্রমণে পরাজিত ও অনেকে নিহত হইল। মহারাজা জয়াজীরাও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। আগ্রা গমন করিয়া সেখানকার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অশ্বরশ্মি সংযত করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। মন্ত্রী

দিনকর রাও এই পরাজয়ের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং রাণীদিগকে নরবর নামক স্থানে প্রেরণ করিয়া তিনিও আগ্রা গমন করিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রভাবে গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল। রাওসাহেব মঙ্গলবাদ্যসহকারে মহাসমারোহে বিজয়গৌরবে গোয়ালিয়র নগরে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র-দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার সমুদয় তাঁহাদের হস্তগত হইল। রাও-সাহেবের সৈন্যগণ এবং গোয়ালিয়র দরবারের সৈনিকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কার লাভ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। নানাসাহেব মহারাষ্ট্রের পেশোয়ার এবং রাওসাহেব সিন্ধিয়ার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। গোয়ালিয়রের একজন অ-পদস্থ পারিষদ হইলেন রাওসাহেবের প্রধান মন্ত্রী।

—উনিশ—

পতন ও অভ্যুদয়

সেনাপতি স্যর-হিউ-রোজ এ-সময়ে ছুটি লইয়া বিলাত যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন গোয়ালিয়রের পতনের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বিলাত যাত্রা স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে গোয়ালিয়রের দিকে যাত্রা করিলেন এবং অতি শীঘ্র গোয়ালিয়রের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন।

স্যর-হিউ-রোজের ন্যায় রণকুশল বীরও কল্পনা করিতে পারেন নাই, ঝাঁসীর রাণী এইরূপ দুঃসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। হিউ-রোজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া অধিনায়কত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি আবার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীদের হাতে গোয়ালিয়র দুর্গ পড়ায় বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছিল,—প্রথমতঃ শীঘ্রই বর্ষাকাল আসিবে, তখন গোয়ালিয়র অঞ্চলের কালো মাটি এমন কর্দ্দমাক্ত হইবে যে, তোপ ও সৈন্য সহকারে, রসদাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই হইবে বিপজ্জনক ; এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। গোয়ালিয়র পুনরায় অধিকার করিতে বিলম্ব হইলে তাত্যা সৈন্যবল, লোকবল, অর্থবল, এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্তির দরুন এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করিয়া কাল্পীর পরাজয়ের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে। সুচতুর রণকৌশলী তাত্যা টোপে এই সুযোগে পেশোয়ার বিজয়-পতাকা দক্ষিণ ভারতের মারাঠা-অঞ্চলে উত্থিত করিবে এবং একে একে শুধু মধ্যভারত নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া ইংরাজের বিজিত রাজ্যসমূহও পুনরায় হস্তচ্যুত হইবে।

স্যর-হিউ-রোজের এইরূপ ভাবনার কারণ অলীক ছিল না। এজন্য গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া তিনি উহা পুনরধিকারের আয়োজন করিলেন। কর্ণেল
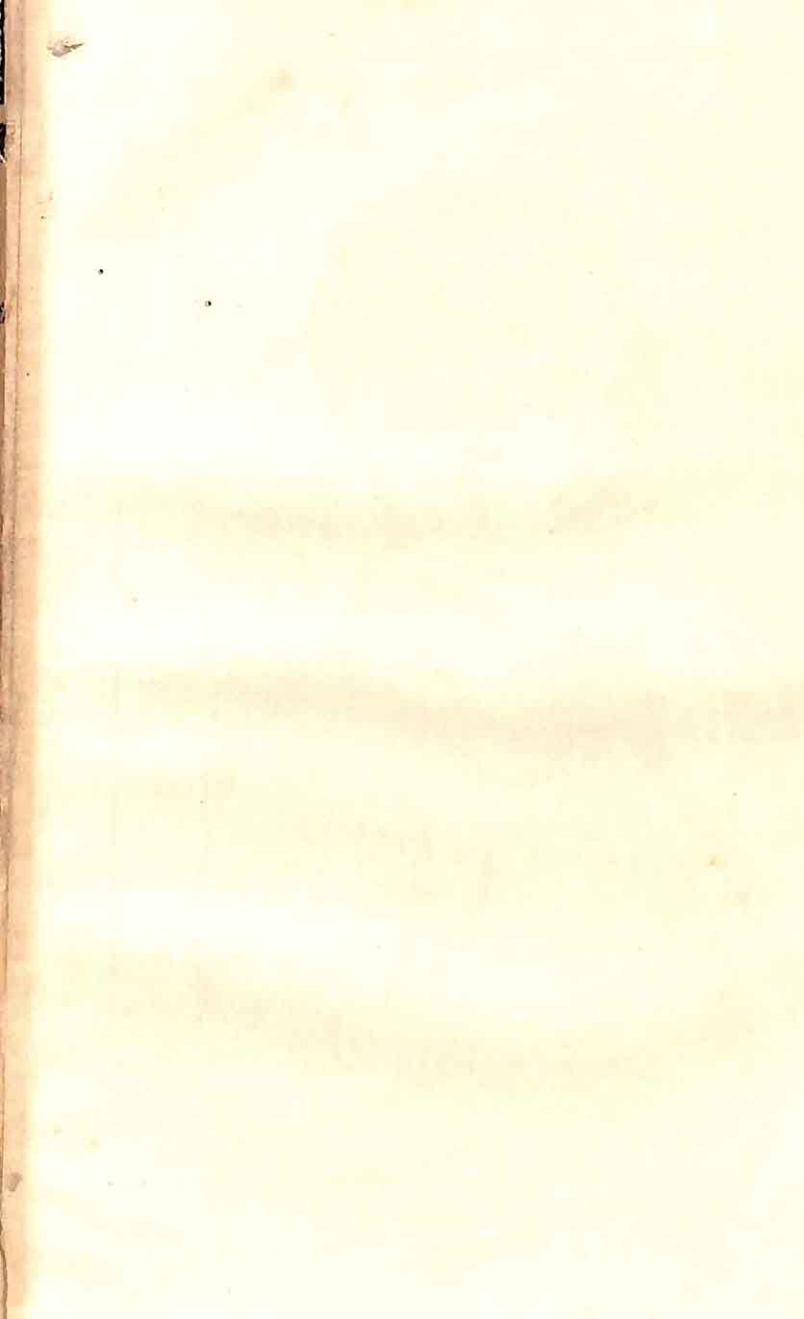
স্যার হিউ রোজ

রিডেল (Riddell), ব্রিগেডিয়ার স্মিথ (Brigadier Smith)—(ইনি রাজপুতনার পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন), কর্ণেল হিক্‌স্ (Lt. Colonel Hicks of the artillery), এবং হায়দ্রাবাদ কন্টিন্‌জেণ্টের মেজর ওর (Major Orr) প্রভৃতি স্যার-হিউ-রোজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন।

৬ই জুন (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) স্যর-হিউ-রোজ এ-সমুদয় সেনানায়ক, তোপাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দিক্ দিয়া তাঁহাদের সৈন্যদল সহ আগ্রা ও গোয়ালিয়রের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ১৯শে জুন তারিখে যাহাতে এক স্থানে সকলে মিলিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়া তিনি ক্রমশঃ গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১৬ই জুন সকাল ৬ ঘটিকার সময় বাহাদুরপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিয়াই হায়দারাবাদ অশ্বারোহীদলের অধিনায়ক কাপ্তেন এবট্‌কে (Captain Abbot) মুরারের দিকে অগ্রসর হইতে অদেশ করিলেন। কাপ্তেন এবট্ সেখানে পৌঁছিয়া জানাইলেন, বিদ্রোহীরা অশ্বারোহী, পদাতিক, কামান প্রভৃতি সাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যাও অনেক।

স্যর-হিউ-রোজ এ-সংবাদে উৎসাহিত হইলেন। রণকৌশলী সাহসী বীরের কাছে এইরূপ সুযোগ এবং শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার প্রলোভন দূর করা কি সম্ভব? এখানে তাঁহার

নিজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার সৈন্যদল প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। প্রখর রৌদ্রের মধ্য দিয়া চার পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে যে কিরূপ ক্লান্তিকর, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বিলম্ব করাও চলে না, তখনও মুরারের ছাউনিতে অনেক সুন্দর সুন্দর বাংলো ও বাড়ী বিদ্যমান ছিল। এই সব বাড়ী-ঘরগুলিতে সৈন্যরা বাস করিবার সুযোগ পাইবে। কালবিলম্ব করিলে এই বাড়ীঘরগুলিতে সৈন্যেরা বাস করিবার সুযোগ পাইবে না। বিদ্রোহীরা হয়ত বাড়ীঘরগুলি পোড়াইয়া ফেলিবে। বিদ্রোহীদের আক্রমণ করা সম্বন্ধে বিলম্ব করা যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া আমি সেদিনই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দিলাম।" [Despatch of Sir Hugh Rose dated the 13th October 1858]

স্যর-হিউ-রোজের সহিত বিদ্রোহীদের মুরারীতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে হিউরোজ এবং তাঁহার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদল পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। মুরারি, স্যার-হিউ-রোজের অধিকৃত হইল। এ-পরাজয়ের কারণ রাওসাহেবের অমনোযোগিতা ও অবহেলা। তিনি শত্রুর আক্রমণবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়াও সৈন্যপরিচালনা সম্পর্কে এবং তাহাদের শৃঙ্খলাবিধানে অমনোযোগী হইয়া, গঙ্গা-দশহরাপর্ব্ব উপলক্ষে গোয়ালিয়রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া পুণ্যসঞ্চয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রাওসাহেব প্রমাদ গণিলেন। রাণী তাঁহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণভোজন অপেক্ষা এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে সৈনিকগণের শৃঙ্খলা-বিধান এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করা, রাণীর কথা অবহেলা করিবার পরিণাম দাঁড়াইল—মুরারির পরাজয়!

১৭ই জুন—সেনানায়ক স্মিথের সহিত কোটা-কি-সরাই [Kotha-ki-Serai] নামক স্থানে রাওসাহেবের যুদ্ধ হইল। এই স্থানের চারিদিক বেড়িয়া খাল থাকার দরুন অশ্বারোহী সৈনিকদের আক্রমণের সুযোগ ছিল না। এখানে সারাদিন যুদ্ধ হইয়াছিল।

রাণী লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যদলের শৃঙ্খলা বিধান ও উৎসাহ প্রদান-পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা মহারাণীর উপর গোয়ালিয়রের পূর্ব্বভাগ রক্ষার ভার পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানায়কদের সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাতে ঘোড়সোয়ার এবং তৎপশ্চাতে পদাতিক সৈন্যদের সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং তোপগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতিরাও তাঁহার এই ব্যূহ রচনা কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-পক্ষের ব্রিগেডিয়ার স্মিথও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনিও নিজ সৈন্যদল দিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাই দ্রুতগামী ও তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণরঙ্গিণী চণ্ডিকা দেবীর ন্যায়, যোদ্ধ বেশে হাতে বিদ্যুৎপ্রভার মত উজ্জ্বল কৃপাণ লইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন।

বিউগল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণীর তোপ হইতে বিপক্ষদের লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্রে করুণ চীৎকার ও মৃতদেহের পর মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। সারাদিন ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিল। লক্ষ্মীবাইয়ের তরবারির আঘাতে শত্রুসৈন্যদের অনেকের মস্তক দেহচ্যুত হইতেছিল। রাণীর সৈন্যসংখ্যা ইংরাজ সৈন্যদের অপেক্ষা কম ছিল। ইংরাজ সৈন্যদের একদল ক্লান্ত হইলে বিশ্রামের অবসর পাইত এবং তাহাদের স্থলে অন্য একদল সৈন্য আসিয়া অধিকার করিত। কিন্তু রাণীর পক্ষে সেরূপ সুযোগ ছিল না। এইভাবে তিন দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিয়াছিল—ইংরাজেরা বিদ্রোহীদের পক্ষের দুই তিনটী তোপ 'বলপূর্ব্বক অধিকার করায় পেশোয়ার সৈন্যগণ হতাশ হইয়া পড়িল—এদিকে আর একদল ইংরাজ সৈন্য রাণীর সৈন্যকে আক্রমণ করায় রাণীর সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। অবশেষে রাণীর পক্ষের পরাজয় হইল এবং ইংরাজ পক্ষ হইল বিজয়ী।

—কুড়ি—

মৃত্যুদূত

রাওসাহেব পরাজিত হইলেন। তৃতীয় দিনের যুদ্ধাবসানে রাণীর বিশ্বস্ত অশ্বটি আহত হইল। এজন্য তিনি গোয়ালিয়রের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়া লইলেন। এই অশ্বই হইল তাঁহার মৃত্যুদূত স্বরূপ। এই ঘোড়াটি দেখিতেছিল যেমন সুন্দর, তেমন ছিল সবল এবং দ্রুতগামী; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, ঘোড়াটির একটি রোগ ছিল, সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিত।

রাণী যখন দেখিলেন তাঁহাদের আর জয়ের আশা নাই, তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ও পরিচারিকা মুন্দরা এবং কতিপয় অনুচর সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। পথে মুন্দরা একজন গোরার হাতে নিহত হইল।

রাণী প্রবল ইংরাজসেনার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এসময়ে তাঁহার হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্র ছিল না। সঙ্গে সৈনিকদলও ছিল না। চারিদিক হইতে তখনও ইংরাজের তোপ হইতে গোলা বর্ষিত হইতেছিল। তথাপি রাণী অদ্ভুত শৌর্য্য ও বীরত্বের সহিত বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণকারীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া তড়িদ্বেগে ধাবিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু

দূরেই একটি সংকীর্ণ খালের নিকট আসিয়া পড়িলেন। ঘোড়া সেই খালের পারে আসিয়া জল দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এ-সময়ে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গোলা আসিয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশে বিদ্ধ হইল।

রাণী খাল পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট ঘোড়াটি কিছুতেই অগ্রসর হইল না। জঙ্ঘাদেশে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় রাণী অনেকটা বল হারাইয়াছিলেন, তবু সঙ্কল্পচ্যুত না হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। খালটি ছিল ক্যাণ্টনমেণ্টের কাছাকাছি। ঘোড়া কিছুতেই খাল পার হইতে চাহিল না। সে পদস্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কয়েকজন ইংরাজ অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত রাণীর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অসিযুদ্ধ হইল। একজন ইংরাজ অশ্বারোহীর অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণভাগ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীণের আঘাত করিল। এইরূপ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়িয়াও বীরাঙ্গনা রাণী সেই আঘাতকারী ও তাহার একজন সঙ্গীকে খড়্গের আঘাতে নিহত করিয়াছিলেন।

রাণীর বিশ্বস্ত অনুচর সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখকে ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে আহ্বান করিয়া লক্ষ্মীবাই ক্ষীণস্বরে বলিলেন: "দেখ, মৃত্যু আমার নিকটে এসেছে, আমার এই মিনতি—আমার মৃতদেহ যেন ইংরাজের হাতে না পড়ে।

তাহলে আমার আত্মা কোনরূপেই শান্তিলাভ করতে পারবে না ” যে দুই তিন জন সর্দ্দার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা আশ্বাস দিলেন, তাঁহাদের জীবন থাকিতে কখনও রাণীর দেহ ইংরাজের হস্তগত হইবে না।

সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। সে কুটীরে যিনি বাস করিতেন তিনি গঙ্গাধর বাবাজী নামে পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের জলপিপাসা লাগিয়াছিল,—বাবাজী তাঁহার মুখে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিলেন। ঐ পবিত্র, স্বাদু গঙ্গাবারি পান করিবার পর তাঁহার মূর্চ্ছা হইল—অন্তিম পিপাসা শান্ত করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পুণ্য আত্মা অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। একবার শুধু শেষ বারের মত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওয়ের দিকে গভীর স্নেহভরে দৃষ্টি করিয়া ঝাঁসীর মহারাণী বীরাঙ্গনা অমরলোকে চলিয়া গেলেন। 'মেরি ঝাঁসী দেঙ্গি নেহি'—বীররাণীর এই উক্তি যুগে যুগে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে।

১৯১৫ বিক্রমসংবতের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে রাণী লক্ষ্মীবাই মহাপ্রয়াণ করিলেন।

সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও তাঁহার শব নিকটবর্ত্তী একটি তৃণস্তূপের মধ্যে রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতার আগুন আকাশ স্পর্শ করিল, দেখিতে দেখিতে বীরাঙ্গনা

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের অপূর্ব্ব লাবণ্যময় দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

গোয়ালিয়রের যে স্থানে রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেখানে একটি মর্ম্মর সমাধি-মন্দির স্থাপিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথা জনগণ সমক্ষে প্রচার করিতেছে।

তারপর কি হইল? ২০শে জুন ইংরাজকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত গোয়ালিয়র রাজধানীতে জয়াজীরাও সিন্ধে ফিরিয়া আসিলেন!

—একুশ—

প্রদীপ নির্ব্বাণ

ইংরাজ ঐতিহাসিক মেলিসন সাহেব বলেনঃ বিদ্রোহী সৈন্যদলের মধ্যে ছিলেন এক অসামান্যা তেজস্বনী মহিলা, যিনি বিদ্রোহী দলের ছিলেন প্রাণস্বরূপ, যাঁহার পরামর্শ, যাঁহার যুদ্ধ পরিচালনা কৌশল ছিল অসাধারণ! পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া কৃপাণ হস্তে এই মহিলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগকে দিতেন উৎসাহ, সুকৌশলে অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত সৈন্যদের লইয়া করিতেন নির্ভীকভাবে যুদ্ধ; তাঁহার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যেদিন ব্রিটিশ সৈন্যেরা গিরিপথ দিয়া একে একে অগ্রসর হইয়া নিরাপদে পর্ব্বত-শিখরে পৌঁছিয়াছে এবং যখন কাপ্তেন

স্মিথ সৈন্যদিগের উপর আদেশ দিলেন বিদ্রোহী সৈনিকগণকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করিতে, তখন কে সেই দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশ সৈন্যগণের বিরুদ্ধে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ? তিনি হইতেছেন—ঝাঁসীর রাণী।

ঝাঁসীর রাণী যেরূপ শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারাইলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রাণী মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহ যেন ইংরাজের হাতে পড়িয়া কলঙ্কিত না হয়। আমি জীবনে ও মরণে বিজয়িনী—আমার সেই কথা রক্ষা করো তোমরা।"

তাঁহার অনুচরগণ অক্ষরে অক্ষরে রাণীর সেই আদেশ পালন করিয়াছিলেন।
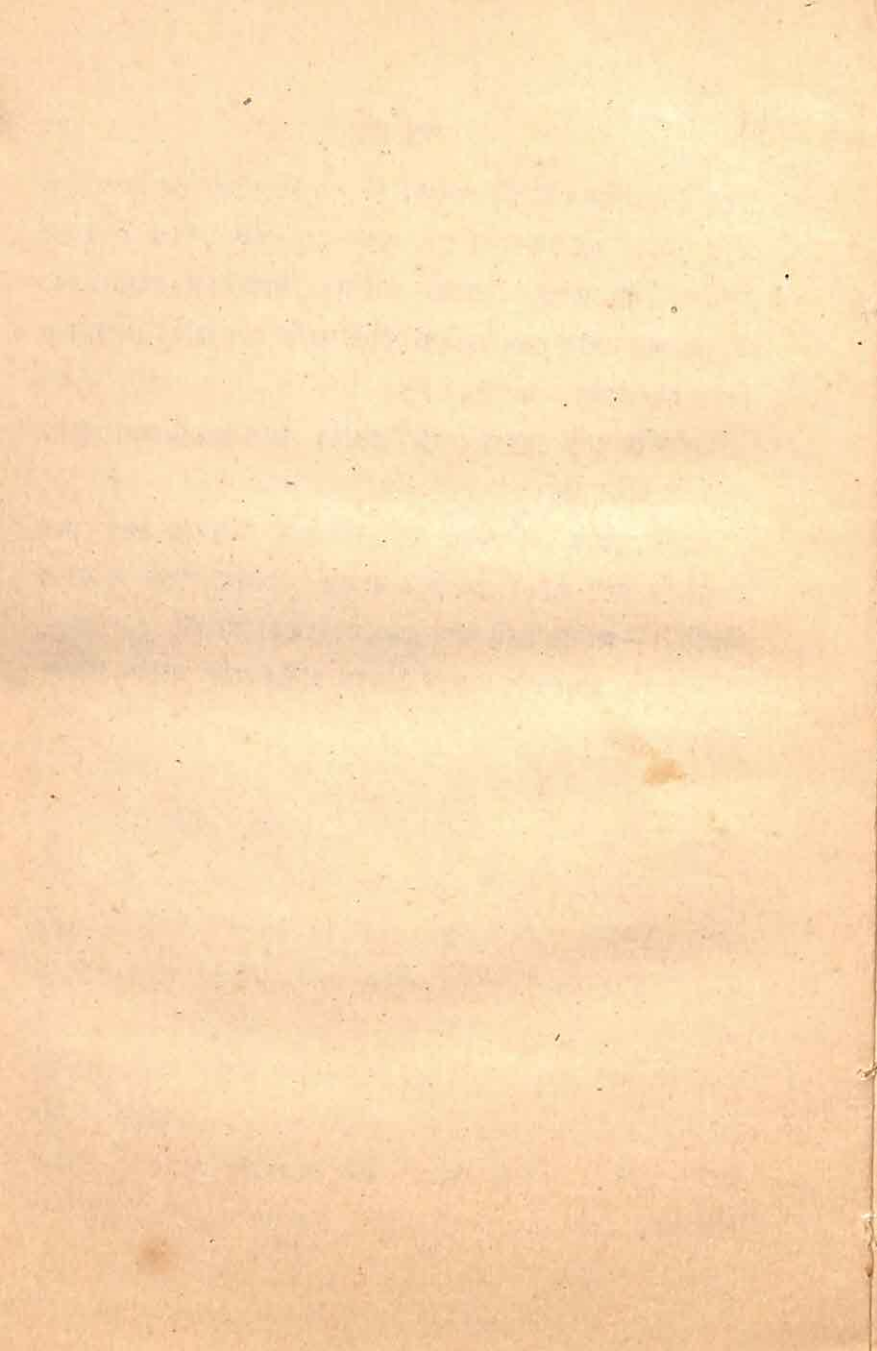
পরিশিষ্ট

ঝাঁসীর রাজ্যের পূর্ব্বকথা

ঝাঁসী উর্ব্বর দেশ। ঝাঁসীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। পর্ব্বত-শ্রেণীর ধূসর শোভা, বনানীর শ্যামলশ্রী, পার্ব্বত্যনদীর কলগীতি এ-প্রদেশটিকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মোগল সম্রাট শাহজাহান যখন ভারতের সম্রাট ছিলেন, সে-সময়ে তিনি পরমর বংশীয় পান্নার সর্দ্দার ছত্রশালকে ঐ প্রদেশটি জাইগীর দেন। ছত্রশাল ঐ সম্পত্তির আয়ে মধ্য-ভারতে এক বিশাল রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রাধান্য সময়ে এলাহাবাদ ও মালবের সুবাদার ছিলেন মহম্মদ খাঁ বঙ্গস্! তিনি ছত্রশালেয় রাজ্য আক্রমণ করিলে, নিরুপায় ছত্রশাল তৎকালীন মারহাট্টা ছত্রপতি শাহুর ক্ষমতাশালী কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী প্রথম বাজিরাওয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বাজিরাও এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরমর ছত্রশালের সহিত মিলিত হইয়া মারহাট্টা সৈন্যদল সহ মহম্মদ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদ খাঁ ছত্রশাল ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মিলিত শক্তির নিকট পরাজিত হইলেন। পরমর ছত্রশাল বাজিরাওয়ের প্রেরিত সৈন্যাধ্যক্ষ রঘুনাথরাও হরি নেবলকারের অপরূপ দেহ-সৌন্দর্য্য, মধুর বিনম্র ব্যবহার এবং তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া এতদূর প্রীতিলাভ করেন যে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পর ঝাঁসীর উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন। নিঃসন্তান ছত্রশাল রঘুনাথ হরিকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ছত্রশালের মৃত্যুর পর রঘুনাথ হরি ঝাঁসীর সুবেদার নিযুক্ত হইলেন।

রঘুনাথ হরি জাতিতে ছিলেন করহদে ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল রাজাপুর। পেশোয়া, রঘুনাথ হরির বীরত্বে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে বিনা দ্বিধায় ঝাঁসীর সুবেদার পদে নিযুক্তি বিষয়ে অনুমোদন করেন। রঘুনাথ হরি স্বীয় বীরত্ব প্রভাবে অল্প সময়েই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন, সে-জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর পেশোয়া, রঘুনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা শিবরাও ভাউকে ঝাঁসীর সুবেদারি পদে অভিষিক্ত করিলেন। শিবরাও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা মধ্যভারত জয় করেন এবং ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে শিবরাও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করিবেন—ঐ সন্ধি দ্বারা তাহাই স্থির হইয়াছিল।

শিবরাওয়ের পর—তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র রাও ঝাঁসীর সিহাসনে বসিলেন। রামচন্দ্র রাওয়ের রাজত্বকালে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন কোন ক্ষুদ্ররাজ্যের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়; তাহারা মিলিত ভাবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। রামচন্দ্র রাও সেই বিদ্রোহ-দমনে কোম্পানীর বিশেষ সাহায্য করেন। সে সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ছিলেন বড়লাট। তিনি রামচন্দ্র রাওয়ের এই সহযোগিতার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ও তৎসহ একখানি ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা ঝাঁসীর দুর্গে উড্ডীয়মান ছিল।

১৮৩৫ সালে রামচন্দ্র রাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ভাবী উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা লইয়া বিরোধ ঘটে। অবশেষে কোম্পানী শিবরাও ভাউয়ের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ রাওকে ঝাঁসীর সিংহাসন প্রদান

করেন। এক বৎসর পরেই রঘুনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর রাওয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও ঝাঁসীর সিংহাসনে বসিলেন। এক হিসাবে তিনি ঝাঁসীর শেষ রাজা।

রাণীর জীবন-বৈচিত্র্য

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইও করহদে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মেরোপন্ত। মোরোপন্তের পিতা বলবন্ত তম্বে সাতারার অন্তর্গত বাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেষ পেশোয়ার এক দত্তক ভ্রাতা অমৃত রাওয়ের অধীনে তিনি কাজ করিতেন এবং তাঁহার সহিত বারাণসী-ধামে বাস করিতেন। অমৃত রাওয়ের মৃত্যুর পর মোরোপন্ত বিঠুরে আসেন এবং পদচ্যুত পেশোয়া বাজিরাওয়ের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মোরোপন্তের মাতৃহীনা কন্যা মনুবাইও পিতার সঙ্গে বিঠুরে আসেন। বাজিরাওয়ের পোষ্যপুত্র নানাসাহেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাও-সাহেব ছিলেন মনু বাইয়ের বাল্যবন্ধু। এক সঙ্গে খেলাধূলা, একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়া—মুক্ত আকাশ ও বাতাসের সঙ্গে মুক্ত প্রান্তরে ইঁহাদের যে সাহস ও নির্ভীক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহারই ফলে এই বালিকা অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।

মনুবাই ছিলেন সুন্দরী ও গুণবতী। কিন্তু করহদে ব্রাহ্মণকন্যার পাত্র করহদে ব্রাহ্মণ হওয়াই আবশ্যক। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও ছিলেন করহদে ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মীবাইয়ের যখন বিবাহের যোগ্য বয়স হইল —অবশ্য সেকালের সামাজিক নিয়ম অনুসারে—তখন মোরোপন্ত কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। এ-সময়ে গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল—তাঁহার পক্ষেও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ বা কঙ্কন ব্যতীত স্বীয় বংশীয় কন্যা সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। এই সুযোগে দ্বিতীয়

বাজিরাওএর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গঙ্গাধর রাও এই সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর লক্ষ্মীবাইয়ের পিতা মোরোপন্ত মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তিতে ঝাঁসীর রাজদরবারের একজন সর্দ্দার পদ লাভ করিলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীবাইয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তিন মাস পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে গঙ্গাধর রাও হতাশ মনে তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা বাসুদেব নেবলকরের পুত্র আনন্দ রাওকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। আনন্দ রাওয়ের নূতন নামকরণ হইল দামোদর গঙ্গাধর রাও। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন মহারাজা গঙ্গাধর-রাও ইংরাজ সরকারকে তাঁহার পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিষয় জানাইলেন এবং এই পোষ্যপুত্র গ্রহণ মঞ্জুর করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। ইহাও উল্লেখ করিলেন, যে পর্য্যন্ত বালক দামোদর গঙ্গাধর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত মহারাণী লক্ষ্মীবাই তাহার হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এ-বিষয়ে একটি গোলযোগ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বতন মহারাজা রামচন্দ্র রাও, সদাশিব রাও নামে একটি বালককে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর নিকট গঙ্গাধর রাওয়ের আবেদনের বিষয় জানিতে পারিয়া সদাশিব রাও কোম্পানীকে জানাইলেন যে—তাহার দাবি কেন বিবেচিত হইবে না? কেননা তিনি পূর্ব্বতন অধিপতি রামচন্দ্র রাওয়ের পোষ্যপুত্র। বড়লাটের দরবার হইতে গঙ্গাধর রাওয়ের আবেদনের সদুত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় রাণী লক্ষ্মীবাই পুনরায় লর্ড ডালহৌসীর নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন এবং তাহাতে উল্লেখ করেন,—তিহিরি, দাতিয়া এবং জলোয়ান তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবার দাবী তাহার আছে, পুত্র দামোদর গঙ্গাধর রাওয়ের অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করিবার অধিকারও তাঁহাকে

দেওয়া হউক। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট বাহাদুর, দামোদর-রাওকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত দিলেন। তিনি গঙ্গাধর-রাও ও রাণীর আবেদন মঞ্জুর করিলেন না। তাহার কারণ ঝাঁসী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য নহে—ইহা কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত করদ রাজ্য। এরূপ স্থলে দাতিয়া ও তিহিরির সহিত ঝাঁসীর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। ভারত সরকার এই অজুহাতে রাণীর আবেদন অগ্রাহ্য করিলে পর লক্ষীবাই বিলাতে পার্লামেণ্টেও লোক মারফত দরখাস্ত পাঠাইলেন, কিন্তু সেখানেও কোন ফল হইল না। যাঁহারা দরবার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন বাঙ্গালী। সে বাঙ্গালীর নাম ছিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণী সহজে কোন বিষয়ে নিবৃত্ত থাকিবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি তাঁহার পোষ্যপুত্র দামোদরের দাবী যাহাতে স্বীকৃত হয়, সেজন্য আরও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাণীর একান্ত দুর্ভাগ্য যে কোন দিক দিয়াই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে ইংরাজ সরকার যে বার্ষিক বৃত্তি দিয়াছিলেন তাহাও তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তেজস্বিনী রাণী মহারাজা গঙ্গাধর-রাওয়ের নিজস্ব সম্পত্তির আয় হইতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এই ঘটনা হইতেও রাণীর মনের বল ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

সিপাহী-বিদ্রোহ ও রাণী লক্ষীবাই

সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাণী লক্ষীবাইকে যে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার প্রথম অশান্তির কারণ ঘটাইয়াছিলেন সদাশিব-রাও। তিনি করায়া

দুর্গ অধিকার করেন এবং নিজেকে ঝাঁসীর রাজা বলিয়া প্রচার করেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ঝাঁসীর দুর্গে রাখিয়া দিলেন। এই ভাবে লক্ষীবাইয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সদাশিব-রাওয়ের আশা উন্মূলিত হইল। ইংরাজেরা যখন ঝাঁসী দুর্গ অধিকার করেন, তখন তাঁহারা দুর্গমধ্যে বন্দী সদাশিব-রাওকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্রিটিশরাজের বিচারে সদাশিব-রাওয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল।

রাণী লক্ষীবাইয়ের অপর একজন প্রবল শত্রু ছিলেন ওর্চা রাজ্যের বন্দেলা রাণা। তিনি ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাইকে অসহায়া মনে করিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ নথেখাঁর অধিনায়কত্বে ঝাঁসী বিজয় করিবার জন্য বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন—লক্ষীবাইয়ের অসাধারণ বীরত্বের কাছে নথেখাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। রাণী তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তা গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট কর্ণেল হেমিল্‌টনের নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু বন্দেলার ধূর্ত্ত কর্ম্মচারীগণ কৌশলে সেই লিপিখানি সংগ্রহ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে হেমিল্‌টন সাহেবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত যোগদান করিয়াছেন, বন্দেলার রাণা ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ঝাঁসী আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে রাণীর প্রতি কি দেশী কি বিদেশী কেহই অবিচার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

রাণী লক্ষীবাইয়ের মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা নারী ভারতের ইতিহাসে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সদাশিব-রাও এবং বন্দেলার রাণাকে পরাজিত করিবার পর রাণী ঝাঁসী রাজ্যশাসনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মণরাও পাণ্ডে; কিন্তু শিক্ষিতা মহারাণী নিজের হাতেই পত্রাদি লিখিতেন এবং রাজ্য

শাসন সম্পর্কে আদেশ ও উপদেশ দিতেন। পুরুষের বেশে সজ্জিতা হইয়া তিনি প্রকাশ্য দরবারে বিচারপ্রার্থীদের আবেদন ও নিবেদন শুনিতেন। অশ্বারোহণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল,—রাজ্যের সর্ব্বত্র অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতেন। এমন কি প্রজাদের কিংবা অধীনস্থ সর্দ্দারদের সীমা ইত্যাদি সম্পর্কে গোলযোগ উপস্থিত হইলে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া আসিতেন। রাজস্ব আদায়ে এবং হিসাব-নিকাশেও তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং অনন্য-সাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য অশ্ব নির্ব্বাচনের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করিতেন। এ-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। সারা ভারতে ভাল ঘোড়া চিনিবার দক্ষতা রাণীর ন্যায় অতি অল্প লোকেরই ছিল, এজন্যও তাঁহার দেশবিদেশে সুনাম ছিল। রাণী লক্ষীবাইয়ের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তাঁহার এই পরিশ্রম, এই শাসন-নৈপুণ্যের পুরস্কার একদিন ব্রিটিশ-রাজ তাঁহাকে দিবেন, পুত্র দামোদর-রাওকে ঝাঁসীর ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত করিতে ইংরাজ গভর্মেণ্ট স্বীকৃত হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না।

স্যার-হিউ-রোজ যখন বিদ্রোহ দমনের জন্য মধ্যভারতে আসিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সগর জয় করিয়া গরহকোটা আসিলেন এবং পরিশেষে ২০শে মার্চ্চ তারিখে ঝাঁসীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাণী তাঁহার নিকট সমুদয় বিষয় বিবৃত করিয়া দূত প্রেরণ করিবার অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণের বিরোধিতায় এবং ইংরাজ সেনাপতির ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপমান-জনক ব্যবহারে বাধ্য হইয়াই একান্ত নিরাশ মনে ইংরাজের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়াছিলেন।

এদিকে রাণী ঝাঁসী রক্ষার জন্য কয়েকদিন ভীষণ যুদ্ধের পর যখন দেখিলেন ঝাঁসী দুর্গ কোনরূপেই রক্ষা করা যাইতেছে না, তখন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে গভীর নিশীথে মাত্র তিনশত সৈন্যসহ ঝাঁসী দুর্গ ত্যাগ করেন। দুর্গ ত্যাগের পর রাণী বিদ্রোহীদলের অধিনায়ক নানাসাহেব, তাত্যা-টোপে এবং রাওসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। গর্ব্বিত রাওসাহেব রাণী লক্ষ্মীবাইকে স্ত্রীলোক মনে করিয়া প্রথমে নেতৃত্ব দিতে এবং তাঁহার নিকট হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাণীর বুদ্ধি ও স্বাভাবিক রণনৈপুণ্য দেখিয়া তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই গোয়ালিয়র দুর্গ বিজয়ে অগ্রসর হন এবং বিজয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত্যুও প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায়ই শত্রুর রক্তে অসি রঞ্জিত করিয়া প্রকৃত বীরের কাম্য মৃত্যুই তাঁহার হইয়াছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে রাণীর বয়স মাত্র ২৩ বৎসর ছিল।

লক্ষ্মীবাইয়ের চরিত্র-বিশ্লেষণ

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে অন্যায়রূপ মন্তব্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই—কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যাকারিণী, বিদ্রোহিণী, এবং বিপ্লবিনীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এমন কি ঝাঁসী সহরে মিঃ এণ্ড্রুজ (Andrews), মিঃ স্কট (Scott) এবং মিঃ পার্শেলের (Purcell) হত্যাকারীরূপেও তাঁহাকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। এই তিন জনের মৃত্যু ঘটে ৭ই জুন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই অপবাদ

প্রচারের মূলে ছিলেন ক্যাপটেন পিঙ্কনে (Captain Pinknay)। তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে তাঁহার প্রেরিত এক রিপোর্টে বলেন—"৭ই জুন তারিখ ঝাঁসী দুর্গ হইতে দুর্গের অধিবাসী ইংরাজদের সাহায্যের জন্য রাণীর নিকট যে তিনজন ইংরাজ প্রেরিত হন, পথে তাঁহারা বিদ্রোহীদলের হাতে পড়িয়া নিহত হন। একজন বাঙ্গালীর নিকট হইতে ("According to a Bengali") জানিতে পারিলাম যে, রাণী লক্ষীবাইয়ের নিকট এ-সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বলেন—ইংরাজদের সাহায্য করিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই—এমন কি তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। [There, 'according to a Bengali,' the queen said that she had no concern 'with the English swine.'] ঝাঁসীর রাণীর অবহেলার জন্যই বিদ্রোহী সিপাহীরা হতভাগ্য ইংরাজ তিনজনকে হত্যা করিতে পারিয়াছিল।"

ক্যাপ্টেন পিঙ্কনের লিখিত বিবরণ যে সত্য নহে, তাহা অন্যান্য নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যে-সময়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে, তখন মহারাণী লক্ষীবাই পর্দানশীন মহিলা ছিলেন। তিনি মারাঠি ভাষায় কথা বলিতেন, এইরূপ স্থলে একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে তাহার ভাষা রাজপ্রাসাদের বাহির হইতে শোনা কিরূপে সম্ভব ছিল ; কাজেই একজন বাঙ্গালী বাহির হইতে, কিরূপে রাণী ইংরাজের প্রতি অন্যায্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া গালি দিয়াছেন সেকথা শুনিতে পাইলেন ? ক্যাপটেন পিঙ্কনে কোন্ বাঙ্গালীর মুখে রাণীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনিয়াছিলেন ? তাহার কি নাম, ঝাঁসীতে তখন তিনি কি কাজ করিতেন, তাহার কোনও উল্লেখ তিনি করেন নাই, কাজেই ইহা যে সত্য নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রাণীর উদারতা ও চরিত্র-মাহাত্ম্য

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের পোষ্যপুত্র দামোদর-রাও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। মিঃ মার্টিন নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোক দামোদর-রাওকে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও রাণী ইংরাজ তিনজনের হত্যা সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিঃ মার্টিন সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ঝাঁসীতে ছিলেন। মার্টিন ও তাহার জনৈক বন্ধু ও একজন ইংরাজ মহিলা কোনরূপে বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া রাজপ্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণী তাহাদিগকে সযত্নে সমুদয় বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের উদার মনোভাব এবং পরোপকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে মিঃ মার্টিনের দ্বারা রাণী জব্বলপুরে কর্ণেল এর্স্কিনের (Cornel Erskine) নিকট ও আগ্রার চীফ কমিশনার কর্ণেল ফ্রেজারের (Colonel Fraser) নিকট যে লিপি প্রেরণ করেন তাহাতেও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন, ইংরাজদের প্রতিভূস্বরূপই তিনি ঝাঁসী রক্ষা করিতেছেন। এ-প্রসঙ্গে মিঃ মার্টিন লিখিয়াছেন ;—"She sent khareets to Col. Erskine at Jabbalpure and Col. Fraser at Agra, which I gave with my own hand."—মিঃ মার্টিন লিখিয়াছেন—"আমি নিজের হাতে রাণীর লিখিত খরিতা (লিপি) দুখানি জব্বলপুরে কর্ণেল এর্স্কিন্ এবং আগ্রার কর্ণেল ফ্রেজারের হাতে দিয়াছিলাম।" পারসনীস্ লিখিত গ্রন্থের ২৫৫ পৃষ্ঠায় এ-বিষয়ের উল্লেখ আছে।

মিঃ মার্টিন দামোদর-রাওকে লিখিয়াছিলেন—"আপনার দুর্ভাগা জননীর প্রতি যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে সে-বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা আমি যেমন জানি অপরের পক্ষে তাহা

জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ঝাঁসীতে ইউরোপীয় অধিবাসীদের যে হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাহার সহিত রাণীর কোন সংস্রব ছিল না, বরং তিনি দুই দিন পর্য্যন্ত দুর্গের অবরুদ্ধ ইংরাজদের খাদ্য ও রসদ যোগাইয়াছিলেন, এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য একশত গোলন্দাজ সেনা পাঠাইয়া দেন, এমন কি রাণী মেজর স্কীন্ (Major Skene) ও ক্যাপ্টেন গর্ডনকে (Captain Gordon) সত্বর দাতিয়া গিয়া দাতিয়ার রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহারা রাণীর সেই সতর্ক বাণী গ্রহণ করেন নাই। পরিণামে তাহারা আমাদের অধীনস্থ সৈন্য, পুলিশ এবং জেলের রক্ষকদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।" আমরা পুনরাবৃত্তি হইলেও রাণা লক্ষীবাই সম্পর্কিত নূতন তথ্যগুলি এখানে প্রকাশ করিলাম।

ভারতের স্বাধীনতা সমরের প্রধানা নেত্রীরূপে এই বীরাঙ্গনা তেজস্বিনী মহিলার স্মৃতি মৃত্যুবিজয়িনী বীরাঙ্গনারূপে যুগে যুগে স্বাধীনতার পুণ্য উৎসব দিনে অমর আসনখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবিত থাকিবে। ইঁহার পুণ্যনামেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী সৈন্য-বাহিনী' গঠন করিয়াছিলেন।

রাণী লক্ষীবাইয়ের সম্বন্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, সেই কর্ণেল মেলিসন (C. B. Mallesan) পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন :—"Whatever her faults in British eye may have been, her countrymen will ever remember that she was driven by ill treatment into rebellion and that she lived and died for her Country."

ব্রিটিশের চক্ষে রাণীকে যতই অবহেলার চক্ষে চিত্রিত করা হউক না, একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ইংরাজের দুর্ব্যবহারের জন্যই রাণী—বিদ্রোহীদলে

যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, ভারতবাসী চিরদিন তাঁহাকে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া রাণী লক্ষ্মীবাইকে চিরস্মরণীয় এবং চিরবরণীয় করিয়া রাখিবে।

ঝাঁসী রাজপরিবারের (নেবলকর বংশীয়) বংশলতা